ও

প্রসূতি কল্যাণ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক

ডাক্তার শ্রী নিশিকান্ত বসু।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রী শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[মূল্য আট আনা মাত্র]

ভূমিকা

নিশিবাবু তাঁহার রচিত "শিশুমঙ্গল" পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। পাঠান্তে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে এই পুস্তকের পরিচয়ের জন্য ভূমিকার আবশ্যক নাই; ইহা নিজ গুণে জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। সুগন্ধি কুসুমের ন্যায় ইহার সুবাস আপনা হইতেই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

ডাক্তার নিশিকান্ত বসু বাংলাদেশের সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-চৈতন্য উদ্বোধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিশিবাবু একজন প্রধান কর্ম্মী। তাঁহার ওজস্বী বহু-তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা বাঙ্গালার পুরুষ ও মহিলা সমাজে স্বাস্থ্য-রক্ষার মূলতত্ত্বগুলির বিস্তৃত প্রচারের প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাবলম্বনের পথ আশ্রয় করিতে তিনি এযাবৎ দেশের লোককে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। ইহা যে শ্রেয়ঃ পথ তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কেবল-মাত্র দৈবনির্ভরতা কাপুরুষের অবলম্বনীয়—"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী"—এই মহা সত্য গত কয়েক বৎসর তিনি তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতায় শ্রোতার হৃদয়ে গভীরভাবে

অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে পুরুষকারের জাগরণের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার এই পুণ্য চেষ্টার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। আমাদের এই অবসাদগ্রস্ত, নির্জ্জীব, ধ্বংসোন্মুখ জাতি স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চালন দ্বারা পুনরুদ্দীপিত হইয়া, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে, জ্ঞানে ও সম্পদে তাহার বংশগত অধিকার পুনরায়ত্ব করিতে সমর্থ হউক।

আমি একস্থলে বলিয়াছি যে শিশু যে কোন জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হইলে মানুষ যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ যে জাতির শিশুগণ দুর্ব্বল দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে সে জাতি কখনও জগতের অপরাপর উন্নতিশীল জাতির ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে শিশুব্যাধি এবং শিশুমৃত্যু যেরূপপ্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়, বোধ হয় তাহা অন্যত্র কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঙ্গালী জাতি যে এত দুর্ব্বল, ইহা তাহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বিবিধ নিবার্য্য সংক্রামক রোগের আক্রমণে বাঙ্গালী নিতান্ত বিপন্ন, বাঙ্গালীর মৃত্যুহার জন্মহার হইতে অনেক অধিক; বাঙ্গালী জাতির উদ্যম, অধ্যবসায়, সাহস ও কর্ম্মশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। এক কথায় এই জাতি দিন দিন ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। এই অমঙ্গল নিবারণের অন্যতম উপায়ঃ—

(১) সবল সুস্থ শিশুর আবির্ভাব;

(২) শিশুজীবন রক্ষা।

যে মহত্তুদ্দেশ্যে ডাক্তার নিশিকান্ত বসু এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন পুস্তকখানি পড়িয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে এই গ্রন্থ তাঁহার উদ্দেশ্য-সাফল্যে যথোচিত সহায়তা করিবে।

পুস্তকের আলোচ্য বিষয় শিশুকল্যাণ ও মাতৃকল্যাণ। গর্ভিণীর কর্ত্তব্য ও তাঁহার পরিচর্য্যা, ধাত্রীর কর্ত্তব্য ও সময়োচিত প্রসূতিপরিচর্য্যা, প্রসবগৃহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, সদ্যজাতশিশুসেবা, প্রসূতি ও শিশুর সাধারণ চিকিৎসা, শিশুখাদ্য, শিশুপালন, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা "হাতে কলমে" সহজ ভাষায় সরলভাবে পুস্তক মধ্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এ দেশের প্রসূতিজীবনের কুসংস্কারমূলক প্রথাগুলির প্রাণঘাতী অনিষ্টকারিতা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। গর্ভিণী, প্রসূতি, ধাত্রী এবং পরিবারস্থ যে কোন মহিলা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। এই পুস্তক বর্ণিত বিষয়গুলি সর্ব্বসাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য। বাটীর কর্ত্তৃপক্ষ পুরুষেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রসবগৃহের জন্য যে সকল ঔষধ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির আবশ্যক যথাসময়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে বহু অমঙ্গল, অর্থনাশ ও অশান্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। আমি এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

আমি গ্রন্থকারের একটী উক্তির সমর্থন করি না। বসন্ত রোগের প্রতিষেধ উপলক্ষে ১০৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে "গাধার দুধ সেবন, কন্টিকারীর পাচন বসন্তের প্রতিষেধক।" আমি যতদূর জানি, এই উক্তির কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নাই, সুতরাং ইহার যে কেবল কোন মূল্য নাই তাহা নহে, ইহাদ্বারা লোকের ভ্রান্ত ধারণা উপস্থিত হইয়া টীকা (vaccination) সম্বন্ধে অনাস্থা উৎপাদন করিয়া অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতে পারে। আশা করি বিজ্ঞ গ্রন্থকার পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে এরূপ অবৈজ্ঞানিক উক্তি পরিহার করিবেন।

পুস্তকের ছাপা সুখপাঠ্য, বর্ণনা আড়ম্বরশূন্য, ছবিগুলি স্বতঃপরিচায়ক। আশা করি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় প্রতি বাঙ্গালীর গৃহে ইহা ব্যবহৃত হইবে।

২৫নং মহেন্দ্র বসুর লেন।
কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯২৭

শ্রী চুণিলাল বসু

ভক্তিভাজন রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু এম্-বি, আই-এস্-ও, এফ্-সি-এস্, সি-আই-ই মহোদয় আমার "শিশুমঙ্গল" পাঠ করিয়া এই ভূমিকাটি লিখিয়া পুস্তকখানির যে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন সে জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে দেশের মঙ্গল হইবে এই আশ্বাসবাণীতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

কলিকাতা,
১৮-২-২৭

শ্রীনিশিকান্ত বসু

নিবেদন

গ্রন্থাকারে কোন বিষয় মুদ্রিত করিয়া, সাধারণে প্রকাশ করিব, এ ইচ্ছা কখনও ছিল না। বিশ বৎসরের অধিক হইল দেশের কল্যাণ কামনায়, বাংলাদেশের সর্ব্বত্র এবং বাহিরে সভা সমিতিতে এই বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করিয়াছি, বন্ধুদের দ্বারা বহুবার অনুরুদ্ধ হইয়াও অযোগ্যতা বোধে কিছু লিখি নাই। তজ্জন্য বন্ধুদের বিরাগ-ভাজনও হইয়াছি। ১৯১৬ সন হইতে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সেবক রূপে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে, আমাদের দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বক্তৃতা করিয়া আসিতেছি, তন্মধ্যে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশের অনেক শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীতে বক্তৃতার জন্য আহুত হইয়া, প্রসবকালীন কর্ত্তব্য, শিশুর খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক কথার যথাযথ উত্তর দিতে যাইয়া এবং বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর ও বোলপুর শ্রীনিকেতনের ট্রেনিংক্লাসের শিক্ষার্থীদিগকে ধাত্রী বিদ্যা বিষয়ে বলিবার সময় বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যে নোট গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সকল নোটে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করার জন্য বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর আমার সহকর্ম্মী বন্ধুদের সাগ্রহ অনুরোধে এই শিশু-মঙ্গল গ্রন্থ সাধারণের জন্য প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম।

এই পুস্তক বাহির করিবার সময় আমি যে সকল পুস্তক

ও মাসিক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার যে সকল বন্ধুরা পরামর্শ দানে লিখিত বিষয়গুলির শৃঙ্খলাবিধানে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর স্নেহাস্পদ যে যুবকত্রয় প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, যাহাদের সাহায্য না পাইলে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব হইত, আমি তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নানা ব্যস্ততার ভিতর গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া বিভিন্ন সময়ের নোটগুলির ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য বিধানে ও বিষয় গুলির শৃঙ্খলা সাধনে হয় ত অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা ক্ষমা করিবেন ; এবং ভুল ত্রুটীগুলি দেখাইয়া দিলে তাঁহাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই গ্রন্থ পাঠে যদি একটী মায়েরও সন্তান পালনে সাহায্য হয়, দেশের কুসংস্কার কিছু পরিমাণেও দূরীভূত হয়, আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। বিশ্বজননীর চরণে আজ ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, মা! তুমি দয়া করিয়া, যাহাদের মা হইবার পবিত্র অধিকার দিয়াছ, তাহাদিগকে মাতৃত্বের দায়িত্ব বুঝিতে ও বহন করিতে সমর্থ কর।

কলিকাতা : } গ্রন্থকার
১লা মাঘ ১৩৩৩। }

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়—প্রসবের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রসব কালীন কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়—প্রসূতি কল্যাণ।

অষ্টম অধ্যায়—শিশু মঙ্গল।

নবম অধ্যায়—প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংক্রামক ব্যাধি বা ছোঁয়াচে রোগ।

দশম অধ্যায়—শিশুর শিক্ষা।

শিশু মঙ্গল

—:*:*:—

প্রথম অধ্যায়

উদ্বোধন

জগতের বর্ত্তমান আদর্শ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ; কোন একটী মাত্র বিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে উঠিলেও সমাজ রক্ষিত হয় না। সমাজ দেহের প্রত্যেক অঙ্গকে দৃঢ়, বলিষ্ঠ করিবার উপরে সমাজ শক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য জনসাধারণের যেরূপ আগ্রহ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্যও নানাবিধ প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে।

দেশের সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা হওয়া কর্ত্তব্য স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে, কেননা অস্বাস্থ্যের জন্য লোকসমাজ ধ্বংশ হইলে, অপর সব উন্নতির কোনই অর্থ থাকে না। মানুষের সর্ব্ব প্রথমে আবশ্যক সুস্থ দেহে জীবিত থাকা। জীবিত না থাকিলে অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার, শিক্ষার প্রসার বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলে কে তাহা সম্ভোগ করিবে? ভারতের ও বাংলার লোক সমাজ আজ ধ্বংশের দিকে।

হাজারকরা জন্মমৃত্যুর হার

	জন্মের হার	মৃত্যুর হার
ইংলণ্ড	২৯.৪	৯.৮
আমেরিকা	২২.৪	৮.৮
জাপান	২৪.১	১৫.৩
ভারত বর্ষ	২৭.২	৩৭.৩

পাঠক পাঠিকা, উপরের লিখিত সংখ্যা দৃষ্টে কি বুঝিতেছেন ? ইংলণ্ডে এক হাজার লোকের ভিতর যেখানে মাত্র ৯ জন মারা যায় সেখানে আমরা ভারতবাসী ৩৭ জন মারা যাই ; কেবল তাহাই নহে, বিলাতে হাজার করা ২৯ জন জন্ম গ্রহণ করিল, মরিল মাত্র ৯ জন ; আর আমাদের দেশে হাজারে ২৭ জন জন্মিল, মৃত্যু হইল হাজারে ৩৭ জনের ; কি ভীষণ অবস্থা ! জন্ম হইতে মৃত্যু বেশী হইলেই বলা হয় যে জাতি ধ্বংশের দিকে। কথাটী আরো পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। মনে করুন ১৯২৩ সালে কোন গ্রামে যেন ১০০০ হাজার লোক ছিল, ১৯২৪ সালে ঐ গ্রামে ২৭টী শিশু জন্মগ্রহণ করিল, মোট লোক সংখ্যা তাহা হইলে দাড়াইল ১০২৭ জন এবং ঐ বৎসরে সেই গ্রামে ৩৭ জন লোকের মৃত্যু হইল। তবে ১০২৭ হইতে ৩৭ বাদ দিলে লোক সংখ্যা দাঁড়াইল ৯৮০। ১৯২৩ সালে যে গ্রামে লোক সংখ্যা ১০০০ ছিল, ১৯২৪ সালে হইল সেই গ্রামের লোক

সংখ্যা কমিয়া ৯৮০ হইল। সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যা এই প্রকার দিনের পর দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

শিশু মৃত্যুর হার আরও ভীষণ। জরা ও, ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুরা জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যুজনিত ক্ষয় পূরণ করে; তাই ইংরাজিতে একটী প্রবাদ আছে—"Save the babies save the Nation"; ইহার অর্থ—"শিশুর রক্ষাই জাতিররক্ষা" কিন্তু ভারতের ও বাংলার শিশু মৃত্যুর হার দেখিলে মনে হয়, এজাতির ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়।

শিশুমৃত্যুর হার (হাজার করা)

	লণ্ডন	আমেরিকা	বাংলা	কলিকাতা
১৯১০	১০০	১০২	অজ্ঞাত	৩৪২
১৯১৫	৯১	৯৫	২১০	৩৪৮
১৯২০	৭৬	৮৩	২০৭	২৮৪
১৯২৪	৭০	৬৬	১৮৪	২৯৪

বাংলায় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যু হাজার করা ১৮২ ছিল।

উপরের লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে আমাদের দেশের শিশু মৃত্যু প্রায় ৪গুণ, ইহা ব্যতিত আরো দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক ৫ বৎসর পর অন্যান্য দেশে শিশুমৃত্যুর হার যেরূপ কমিতেছে আমাদের দেশে তদ্রূপ কমিতেছেনা বরং কোথাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯২০ সালে কলিকাতায় শিশুমৃত্যু ছিল হাজার করা ২৮৪, ১৯২৪ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া হাজার করা ২৯৪ হইয়াছে। অনেকে হয়ত তর্কস্থলে বলিবেন যে বিলাতে ও আমাদের দেশের জল বায়ুর বিভিন্নতার জন্য শিশু-মৃত্যুর এত প্রভেদ হইয়াছে, কিন্তু একই কলিকাতা সহরে বাস করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর শিশুমৃত্যুর হারের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে।

কলিকাতায় শিশু মৃত্যু (হাজার করা)

	১৯১৪	১৯২৪
ইউরোপিয়ান	১৪২	অজ্ঞা
হিন্দু	২৬৯	১৯২
মুসলমান	৩৪৯	৪১১
দেশীয় খৃষ্টান	অজ্ঞাত	২১১

এই সকল প্রভেদের ২টী কারণ সর্ব্ব প্রধান।

(১) অশিক্ষা এবং (২) আর্থিক অসচ্ছলতা। যে সম্প্রদায় যত দরিদ্র এবং যাদের ভিতর শিক্ষাবিস্তার বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা যত কম তাদের ভিতর শিশু মৃত্যু তত বেশী।

এই যে অকাল শিশু মৃত্যু ইহাই জাতি ধ্বংশের কারণ বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীর সম্পাদক দেশহিতব্রত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ১৯১৮ সনে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সমাজ তথ্য প্রদর্শনীতে শিশুমঙ্গল বিভাগের "চার্টে" লিখিয়াছেন,—

শিশুই মানব সমাজের ভিত্তি

সুতরাং

শিশু মঙ্গলই গৃহমঙ্গল,

সমাজ মঙ্গল,

ও জাতিমঙ্গল।

সুখের বিষয় এই অকাল শিশু মৃত্যু নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনে একটী আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও প্রত্যেক বৎসর দেশের নানাস্থানে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর দ্বারা শিশু মৃত্যুর কারণ এবং তাহা নিবারণের উপায় প্রদর্শন করাইয়া দেশের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন।

এক সময়ে ইউরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্রই—শিশু মৃত্যুর হার আমাদের দেশেরই মত ছিল, কিন্তু তাহারা আমাদের মত অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার জাতি নহে। সর্ব্ব প্রথমে ফ্রান্সের একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। তারপর হাইডার্শফিল্ডের মেয়র এবং মেডিক্যাল অফিসার ইংলণ্ডে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং নানা স্থানে শিশু মঙ্গল প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া শিশু মৃত্যু নিবারণের উপায় বিষয়ক লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত এবং বিস্তার করেন। ফলে ইংলণ্ডের শিশুমৃত্যু কমিয়াছে। সুখের বিষয় ১৯২৪–২৫ খৃষ্টাব্দে সদাশয়া বড়লাটপত্নী লেডী চেমস্‌ফোর্ড কর্ত্তৃক এদেশে একটি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান গঠিত

হইয়াছে, এবং সেই সময় হইতে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় বাংলা-দেশের বিভিন্ন সহরে প্রত্যেক বৎসর ইহার প্রদর্শনী হইয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাংলা গবর্ণমেণ্টের পাবলিক্‌হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট হইতে সমাজতথ্য প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া শিশুমঙ্গল বিষয়ে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল।

শিশুমঙ্গলবিষয়ক আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে প্রসূতির কল্যাণ কর কয়েকটি কথা বলিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক, কারণ এদেশের শিশুমৃত্যু যেমন ভীষণ, প্রসূতিদের মৃত্যু সংখ্যা ও তদ্রূপ। বিলাতে ২০০০ হাজার প্রসূতির ভিতরে প্রসবজনক ব্যাধিতে ১জন আর আমাদের দেশে ২০০০ প্রসূতির ভিতর মৃত্যু হয় ৫০ জনের, অর্থাৎ বিলাতের ৫০ গুণ বেশী। অতএব শিশু-মঙ্গলের বিষয় লিখিবার সঙ্গে প্রসূতির কল্যাণ বিষয়ে কিছু লিখিত হইল।

মনে রাখিবেন—**বাঙ্গালায় প্রত্যেক দিন শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ৮১৬ এবং প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা ২০০।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋতুস্রাব

দেশের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, সামাজিক রীতি, নীতি প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন দেশের স্ত্রী জাতির মধ্যে ঋতু কালের ইতর বিশেষ দেখা যায়। আমাদের দেশের মেয়েদের সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর এবং বিলাতে ১৪।১৫ বৎসর বয়সে ঋতু আরম্ভ হয়। ৪০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সে ঋতু বন্ধ হয়।

প্রত্যেক মাসে ২৮ হইতে ৩০ দিন পর জরায়ু হইতে যে রক্ত স্রাব হয় তাহাকে মাসিক ঋতু কহে। ৪।৫ দিন এই ঋতুস্রাব থাকে, এই সময় প্রত্যেক মেয়েরই বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য, অন্যথা চির জীবন নানাপ্রকার রোগ যাতনা সহ্য করিতে এবং দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তানের মা হইয়া থাকিতে হইবে।

ঋতুর সময় নিম্নলিখিত নিয়ম প্রতিপালন করা বিধেয়।

(১) ঋতুস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করিবে না।

(২) গাড়ী চড়া, উচ্চ স্থানে উঠা নামা, স্থানান্তর গমন ও কোন ভারী বস্তু উত্তোলন সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। এই

সকল করিলে, এবং শারীরিক পরিশ্রমে অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে পারে। এজন্য বিশ্রাম প্রয়োজন।

(৩) ঠাণ্ডা মেজের উপর শয়ন করিবেনা ও পেটে ঠাণ্ডা লাগাইবে না।

(৪) স্রাবের জন্য ময়লা নেকড়া ব্যবহার করিবে না। নেকড়া ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই তাহা সোডায় সিদ্ধ করিয়া বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিবে, যেন ধূলা ময়লা না লাগে, এবং ঐ পরিষ্কার নেকড়া ভাজ ভাজ করিয়া প্রসব দ্বারে রাখিয়া, অপর একখানা নেকড়া নেংটির মত উহার দুই প্রান্ত কোমড়ের দড়ির সঙ্গে বান্ধিয়া দিবে এবং আবশ্যক মত দিনের ভিতর ৩।৪ বার নেকড়া বদলাইবে। অনেক স্ত্রীলোক প্রসব দ্বারের ভিতর নেকড়া ভরিয়া দিয়া রাখেন, এ প্রথা দূষণীয়।

(৫) স্রাব বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত স্নান করিবে না।

(৬) সহজে হজম হয় এরূপ আহার করিবে। গুরু-পাক দ্রব্য আহার করা নিষিদ্ধ।

বাধক বেদনা—

অনেক স্ত্রীলোকের ঋতু ঠিক ৩০ দিন পর পর না হইয়া কখনও নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে, কখনও বা নিয়মিত সময়ের পরে হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অনেকের ভয়ানক বেদনা হয়, বেদনায় ছট ফট করিতে হয়, স্রাব প্রায়ই অল্প বা অধিক হইয়া থাকে। এই প্রকার অস্বাভাবিক মাসিক

ঋতুর জন্য গর্ভ সঞ্চারের ব্যঘাত হয়, অতএব এইরূপ অবস্থা হইলে সুচিকিৎসক ডাকিয়া চিকিৎসা করান বিশেষ কর্ত্তব্য।

শ্বেতপ্রদর (লিউকোরিয়া)—

প্রসব পথ হইতে চূণের জলের মত এক প্রকার স্রাব হয়। উক্ত স্রাব কাপড়ে লাগিলে ইষৎ হরিদ্রার আভাযুক্ত সাদা দাগ লাগে। শারীরিকদৌর্ব্বল্য, জরায়ুর প্রদাহ, গণোরিয়া প্রভৃতির জন্য এইরূপ শ্বেতপ্রদর রোগ হইয়া থাকে, এই রোগের জন্য সন্তান সম্ভাবনা কম হয়, কিম্বা সন্তান হইলেও রুগ্ন দূর্ব্বল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং এই সকল রোগের জন্য সর্ব্বদাই সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

গর্ভসঞ্চার

শিশুরাই পরিবারের ও জাতির ভবিষ্যৎ আশা। শিশুরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিধাতার অনির্ব্বচনীয় করুণায় বর্দ্ধিত হইয়া নিয়মিত সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় সন্তানের জন্ম, ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে মোটা মুটী একটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

গর্ভধারণের যন্ত্র ইউটেরাস বা জরায়ু তলপেটে অবস্থিত, ইহার বর্দ্ধিত অবস্থায় দেখিতে অনেকটা ফানুষের মত, নিম্নভাগ যোনির দ্বার দেশে অবস্থিত। জরায়ুর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে এক একটী ডিম্বকোষ বা ওভেরী আছে, প্রত্যেক ডিম্বকোষ একটী সরু নল দ্বারা জরায়ু বা ইউটেরাসের সঙ্গে যুক্ত। ইহাকে ডিম্ববাহী নল বা ফ্যালপিয়ন্ টিউব কহে। জরায়ুর সম্মুখ ভাগে মূত্রাশয় বা ব্লাডার এবং পশ্চাৎ দিকে মলনালী অবস্থিত।

গর্ভ সঞ্চারের কারণ—

ডিম্বকোষের ভিতর অনেক ডিম্ব থাকে, ঐ ডিম্বের পরিপক্ক অবস্থায়, তাহার আবরণ ফাটিয়া যায়, এবং উক্ত ডিম্ব, ডিম্ববাহী নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে উপস্থিত হয়, তথায় পুরুষের শুক্রবীর্য্যের সহিত মিলিত হইলে ভ্রূণের (সন্তানের) সৃষ্টি হয়। মাসিক ঋতুর ৬ হইতে ১২ দিনের ভিতর সাধারণত গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে।

গর্ভ সঞ্চারের তিন মাস পর জরায়ুর মুখ একেবারে বুজিয়া যায়, এই সময় জরায়ু গাত্রের উপরি ভাগে প্লেসেণ্টা বা ফুলের সৃষ্টি হয়, এই ফুলের সঙ্গে সন্তানের নাভির সঙ্গে একটী নলের দ্বারা যুক্ত থাকে, ইহাকে নাভি নাড়ী রজ্জু কহে। ইহা দেখিতে দুইটী একত্র পাকান দড়ির মত দেখায়। ইহার ভিতর দিয়া মাতৃদেহের রক্ত সন্তানের দেহে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের প্রতিপালন ও বৃদ্ধি সাধন করিতে থাকে।

মায়ের দেহের রক্তের বিশুদ্ধতা এবং পিতার শুক্র বীর্য্যের সবলতা ও সুস্থতার উপরই গর্ভ সঞ্চার ও সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কেবল তাহাই নহে, পিতা মাতার মানসিক অবস্থার উপরেও সন্তানের চরিত্র অনেকাংশে নির্ভর করে।

গর্ভের লক্ষণ—

(১) মাসিক ঋতু বন্ধ হওয়া।

(২) স্তনের আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে, বোঁটা বড় ও কালো হয়।

(৩) পেট বড় হইতে থাকে। জরায়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেট বড় হইয়া আস্তে আস্তে নবম মাসে বুকের পাঁজর পর্য্যন্ত উঠে।

(৪) অধিকাংশ পোয়াতীর ২।৩ মাস হইতে গা বমি বমি করে। কোন কোন গর্ভিণী আহারের পর বমি করিয়া থাকে।

(৫) অনবরত থুতু উঠে।

(৬) আহারে অরুচি, কোন কোন গর্ভিণীর পোড়া মাটী প্রভৃতি আহারে স্পৃহা দেখা যায়।

(৭) মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, খিট খিটে স্বভাব হয়।

(৮) পেটের ভিতর সন্তান নড়ে। পঞ্চম মাস হইতে গর্ভিণী পেটের ভিতর সন্তান নড়া অনুভব করে। ইহা এবং

সন্তানের হৃদপিণ্ডের শব্দ ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে শ্রবণ করিলেই গর্ভ সঞ্চার সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। কিন্তু মাসিক ঋতু বন্ধ, পেট বড় হওয়া প্রভৃতি রোগের জন্য ও হইতে পারে।

গর্ভস্থ সন্তানের আকার—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর অকার বর্দ্ধিত হয়।

(১) গর্ভসঞ্চারের সময় ভ্রূণের আকার একটী মটর প্রমাণ।

(২) ২য় মাসে একটী মুরগীর ডিমের মত, এক ইঞ্চি লম্বা, ছেলের মাথা কান বোঝা যায়।

(৩) তিন মাসের শেষে পোরো শুদ্ধ একটী রাঁজহাঁসের ডিমের মত, ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা, মাথা, কান, হাত, পা স্পষ্ট বোঝা যায়।

(৪) চারি মাসের শেষে ৬ ইঞ্চি লম্বা হয়, স্ত্রী, পুরুষ ভেদ করা যায়।

(৫) পাঁচ মাসের ভ্রূণ ১০ ইঞ্চি লম্বা, মাথায় চুল, হাতে পায়ে নখ হয়। এই সময়ে পেটের ভিতর নড়ে।

(৬) ছয় মাসে ১২ ইঞ্চি লম্বা।

(৭) সাত মাসে ১৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। চক্ষু খুলে যায়।

(৮) আট মাসে ১৬ ইঞ্চি লম্বা হয়।

(৯) নয় মাসে ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়, পুরো মাসে সন্তান ২০ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

গর্ভিনীর কর্ত্তব্য।

চরক সংহিতার নিম্নলিখিত বচনে গর্ভাবস্থায় মাতার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা।

"মাতৃজং চাস্য হৃদয়ং মাতৃহৃদয়াভিসম্বদ্ধং রসবাহিনীভিঃ সম্পদ্যতে"……

অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় মাতা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই হেতু মাতার হৃদয়ের সহিত গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ থাকে। রস বাহিনী ধমণী দ্বারা মাতার ও গর্ভস্থ সন্তানের যোগ থাকে, মাতার শরীরের রক্ত নাভি নাড়ী রজ্জুদ্বারা সন্তানের শরীরে প্রবাহিত হয়।" এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ গর্ভাবস্থায় প্রতিকুল আহার ও আচরণাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ ইহাতে গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসক বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম্ ডি, মহোদয়ও চরক সংহিতার মতের সমর্থন করিয়াছেন, যথা ঃ—

(১) "গর্ভস্থ সন্তান ও মাতার মধ্যে একমাত্র শোণিত সঞ্চালন দ্বারাই যোগ রক্ষিত হয়। জননীর দেহের শোণিত ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে,

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের আচার ব্যবহার ও চরিত্র সংগঠিত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, মাতা যে আহার্য্য গ্রহণ করিবেন, তাহাই রক্তে পরিণত হইয়া উক্ত শোণিত মাতার ও ভ্রূণের দেহ গঠন করিবে এবং ঐ শোণিতের ভিতর সন্তানের ভাবী জীবন ও চরিত্র গঠনের উপাদান নিহিত থাকে।"

(২) "খাদ্য দ্রব্যের সার ভাগ রক্তে পরিণত হইয়া মানব দেহের পুষ্টিসাধন করে; ঐ সার ভাগ রক্তে পরিণত হওয়ার সময়ে মানব মনের সৎ অসৎ চিন্তা ঐ সার ভাগের উপর কার্য্যকরে সুতরাং মানব প্রকৃতি ঐ সার ভাগে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে স্নায়ুমণ্ডলে তৎপরে চরিত্রে শোণিতের ক্রিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্যের দোষ গুণের উপরে সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

গর্ভাবস্থায় খাদ্যাদির নিয়ম—

"গর্ভাবস্থায় যে নারী সর্ব্বদা মদ্যপান করে, গো ও বরাহ মাংস ভক্ষণ করে, মৎস্যমাংসপ্রিয় হয়, যে সর্ব্বদা মধুর, অম্ল, লবণরস, ঝাল, তিক্ত, কষায় রস পান করে তাহার সন্তান বিকৃত ও নানা রোগ গ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।"

চরক সংহিতা।

"শিশুর পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিশুদ্ধ রক্ত আবশ্যক। গর্ভিণী চর্ব্বিযুক্ত মাংসাদি, গরম মসলা, চা, কাফি, মাদক দ্রব্য

আহার করিলে, তাহার প্রিয়দর্শন সুন্দর পবিত্র সন্তান উৎপাদন করা একরূপ অসম্ভব। মাতার মাংসাদি আহার করা সন্তানের পক্ষে কোন অবস্থায়ই মঙ্গল জনক নহে।"

জন কাউয়েন্ এম, ডি।

গর্ভাবস্থায় আহার বিহারের দোষে সন্তানের যে যে অনিষ্ট হয় মহর্ষি আত্রেয় তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যথা—

(১) "যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা মদ্য পান করে, তাহার অস্থির চিত্ত সন্তান হয়।"

(২) "যে গর্ভিনী সর্ব্বদা মাংস ভক্ষণ করে, তার সন্তান ধীরে ধীরে চক্ষুর নিমেষ ফেলে ও চক্ষুরোগ গ্রস্ত হয়।"

(৩) "গর্ভাবস্থায় যে সর্ব্বদা মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করে তার সন্তান স্থূল ও বোবা হয়।"

(৪) "গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা যে লবণ রস ভক্ষন করে তাহার সন্তানের অল্পবয়সে চুল পাকে, ও মাথায় টাক পড়ে।"

(৫) "গর্ভাবস্থায় যে সর্ব্বদা অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করে, তার সন্তান চর্ম্মরোগগ্রস্ত হয়।"

(৬) "গর্ভাবস্থায় সে সর্ব্বদা ঝাল জিনিস খায়, তার সন্তান অতি দুর্ব্বল অল্প শুক্র বিশিষ্ট হয়, তজন্য সন্তানোৎপাদন শক্তি হীন হয়।"

(৭) "যে গর্ভিণী সর্ব্বদা তিক্তরস ভক্ষণ করে তার সন্তান যক্ষ্মা রোগ গ্রস্ত হয়।"

(৮) "যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা কষায় রস ভক্ষণ করে তার সন্তান নানাবিধ রোগ গ্রস্ত হয়।"

উপরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঋষিদিগের গর্ভাবস্থার খাদ্য গ্রহণের মত উল্লিখিত হইল। ইহা দ্বারা প্রত্যেক মাতা বুঝিতে পারিতেছেন যে খাদ্য গ্রহণের দোষে সন্তানের কত অনিষ্ট হয়। সুসন্তান লাভ করিতে হইলে কি প্রকার খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, নিম্নে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) সহজে হজম হয় এরূপ পুষ্টিকর খাদ্য প্রত্যেক দিন নির্দ্দিষ্ট সময় গ্রহণ করিবে। ভাত, মাছের ঝোল, মশুর মুগের ডাল, আলু, পটল, পেঁপে অন্যান্য তরকারী রুটী, লুচী হালুয়া, মাখন দুধ খাইবে। মাংস ডিম না খাওয়াই ভাল, প্রত্যেক দিন একবলক্ দুধ যথেষ্ট খাওয়া উচিত।

(২) সকল প্রকার টাট্‌কা ফল, যথাসম্ভব প্রত্যেক দিন খাওয়া উচিত, কমলা লেবু পাকাকলা, আম, পেঁপে, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি এবং প্রত্যেকদিন প্রাতে কাচামুগ ভিজান নারিকেলের সঙ্গে অথবা ছোলা ভিজান (যখন অঙ্কুর বাহির হয়) আদার সঙ্গে খাওয়া বিধেয়।

(৩) গর্ভাবস্থায় প্রচুর পরিমাণ ঠাণ্ডাজল খাওয়া উচিত, কেননা গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট প্রস্রাব হওয়া বিশেষ আবশ্যক, জল খাইলে প্রস্রাব হয়। আহারের সময় জল খাওয়া উচিত নয়, আহারের অন্ততঃ ২ঘণ্টা পর জল খাইবে। দিনে মোটের উপর ১ সের হইতে ১॥০ দেড় সের জল খাওয়া কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক দিন যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তৎবিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক দিন শয়নের পূর্ব্বে ও প্রাতে ১গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

নিদ্রা—

প্রত্যেক দিন ৮ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা ভাল নয়।

পরিচ্ছদ—

সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ব্যবহার করিবে, কোমরে খুব আঁটিয়া কাপড় পরা উচিত নয়, ইহাতে গর্ভস্থ সন্তানের স্বাভাবিক গতির অসুবিধা হওয়ায় সন্তান বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় এবং অন্যান্য কারণে মাতা ও সন্তান উভয়েরই অনিষ্ট হয়।

স্নান—

প্রত্যেক দিন নিয়মিত স্নান করিবে।

এক্ল্যাম্‌সিয়া বা মূর্চ্ছা—

গর্ভাবস্থায় এই রোগ অতিশয় বিপজ্জনক। গর্ভের ৭ মাস হইতে প্রসব পর্য্যন্ত, কখনও বা প্রসবের পর এই রোগ দেখা যায়। শরীরের ভিতর এক প্রকার বিষ সঞ্চিত হইয়া এই রোগ প্রকাশ পায়। ইহার লক্ষণ সর্ব্বদা মাথা ধরা, চক্ষে ঝাপ্‌সা দৃষ্টি, কখন বা চক্ষু মুখ হলুদ বর্ণ, অনিদ্রা, প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া এবং তৎসঙ্গে পা ফোলা। এই সব লক্ষণের পর প্রসূতির ফিট হইতে আরম্ভ হয়। ফিটের সময় হাত পা কাঁপিতে থাকে, শ্বাস বন্ধ হইয়া মুখ নীল বর্ণ হয়। এইরূপ

২।৪ বার ফিট ছাড়িয়া ছাড়িয়া হওয়ার পর রোগিণী অজ্ঞান হইয়া যায়, কিছু খাইতে পারেনা, পরে দুর্ব্বল হইয়া মারা যায়।

অশিক্ষিত লোকেরা ইহাকে ভূতের দৃষ্টি মনে করিয়া ওঝার সাহায্য গ্রহণ করে; বাস্তবিক পক্ষে ভূতের কার্য্য নয়, ইহা শরীরে এক প্রকার বিষ ক্রিয়ারই ফল। এই সময় পোয়াতীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে এই বিষ ধরা পড়ে।

পোয়াতীর যদি অনিদ্রা, মাথাধরা এবং তৎসঙ্গে পা ফোলা থাকে তখনই চিকিৎসক ডাকিবে, বিলম্ব করিলে ফিট হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। উপরোক্ত লক্ষণ টের পাইলেই পোয়াতীকে নির্জ্জন ঘরে রাখিবে, মল মূত্র যাহাতে পরিষ্কার হয় তাহা করিবে। যথেষ্ট পরিমাণে জলবার্লি, দুধ, সরবৎ, ডাবের জল খাইতে দিলে, প্রস্রাব যথেষ্ট পরিমাণে হইলে এই বিষ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

রক্তহীনতা—

গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের দেহ বর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয় মায়ের শোণিত দ্বারা। এই সময় মায়ের শরীরে রক্তহীনতা হইলে মা ও সন্তান উভয়েরই অনিষ্ট হয়। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, জ্বর, আমাশয় ইত্যাদির জন্য এই রক্তহীনতা হইয়া থাকে। এই অবস্থা হইলে ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করিবে, এবং গর্ভিণীর জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে।

পরিশ্রম—

গর্ভাবস্থায় সহজ পরিশ্রমের কাজ, যেমন সংসারের নিত্য কাজ কর্ম্ম, করা ভাল, ইহাতে সহজ প্রসবের সাহায্য করে। গর্ভাবস্থায় যে সব স্ত্রীলোক কাজ কর্ম্ম বিহীন হইয়া আলস্যে দিন যাপন করে, তাহাদের প্রসব হইতে বিশেষ কষ্ট হয়। কিন্তু এমন কোন পরিশ্রমের কাজ করা উচিত নয়, যাহাতে গর্ভিণী পরিশ্রান্ত হন।

স্থানান্তর গমন—

অল্প মাসে অর্থাৎ ৪ মাসের পূর্ব্বে ও অষ্টম মাস হইতে স্থানান্তরে গমন বিপদ জনক। বিশেষ আবশ্যক হইলে পঞ্চম মাস হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত স্থানান্তর গমন করা যাইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের উপর মাতার মানসিক ভাবের ও আচার ব্যবহারের প্রভাব।

ভ্রূণের চরিত্র গঠনের সহিত মাতার মানসিক অবস্থার সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ট। ভ্রূণের পৃথক কোন মন থাকে না, মায়ের মনের ভাবনিচয় দ্বারা শিশুর মন গঠিত হয়। গর্ভাবস্থায় বাহ্য বস্তু দর্শন জন্য মাতার মনে যে ধারণা জন্মে গর্ভস্থ ভ্রূণ ও তদ্রূপ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সুশ্রুত সংহিতা বলিতেছেন "শিশু পিতামাতা হইতে যে কেবল তাহাদের অবয়ব ও বর্ণ প্রাপ্ত হয় এমন নহে, পিতা মাতার স্বাস্থ্য, স্বভাব চরিত্র ও সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও

মানসিক ব্যাধি ও বিকৃতি ন্যূনাধিক পারিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকে”।

অতএব গর্ভিণীর মানসিক ভাবের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। মহর্ষি আত্রেয় মাতার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিশেষ প্রনিধানযোগ্য কথা বলিয়াছেন।

(১) “গর্ভাবস্থায় যে স্ত্রী সর্ব্বদা শরীর সঞ্চালন করিয়া ঝগড়া করে তাহার হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মে”।

(২) “যে গর্ভিণী সর্ব্বদা পুরুষসংসর্গ করে তার সন্তান কানা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, নির্লজ্জ অথবা স্ত্রৈণ হইবে।”

(৩) “যে গর্ভিণী সর্ব্বদা পরদ্রব্যে অভিলাষ করে তার সন্তান পরের পীড়াদায়ক, অত্যন্ত ঈর্ষাবান্ বা স্ত্রৈণ হয়।”

(৪) “যে গর্ভিণী চৌর্য্যশীলা তাহার সন্তান অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদা কলহ ও মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকে।”

(৫) “ক্রোধশীলা গর্ভিণীর সন্তান ক্রোধপরায়ণ ও কপটাচারী হয়।”

(৬) “যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা নিদ্রা যায় সে মূর্খ সন্তান প্রসব করে।”

(৭) “গর্ভিণী হস্ত পদ এবং অন্যান্য অঙ্গ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলে সন্তান উন্মত্ত হয়।”

নিম্নলিখিত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঘটনা দুইটী দ্বারা

পিতামাতার মানসিক চিন্তার প্রভাব গর্ভস্থ সন্তানের উপর কতটা কার্য্যকারী তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

(১) ভক্তিভাজন আচার্য্য স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ধর্ম্মজীবন নামক ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "কোন ধর্ম্মভীরু ভদ্রলোক একদিন রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার সাম্‌নে এক পাখীর শাবক পতিত হয়। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে পাখীর বাচ্চাকে ধরিয়া ফেলেন, তখন উহার পা দুখানি দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া গেল ; তদ্দর্শনে ধর্ম্মভীরু ভদ্রলোক মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইলেন। তিনি যতবার পক্ষিশাবকটিকে গাছের ডালে বসাইবার চেষ্টা করিলেন তত বার সে পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় ভদ্রলোক দীর্ঘকাল মানসিক যাতনায় বিষণ্ণ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মানসিক যাতনার ভিতর ২ বৎসর পরে একটী সন্তান হইল। তিনি বাহির বাড়ীতে গ্রামস্থ লোকের সহিত নানা প্রসঙ্গ করিতেছিলেন তখন সংবাদ আসিল 'আপনার একটি খোঁড়া সন্তান হইয়াছে।' তখন তিনি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'ঠাকুর, এতদিনে আমার পাপের প্রায়চিত্ত হইল।"

এই ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার মনে হয়, পক্ষী শাবকের যাতনামূলক স্মৃতিনিয়া ভদ্রলোকটীর ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করার ফলে খোঁড়া হইয়াছিল।

২। বংলা দেশের কোন বিখ্যাত চিকিৎসকের একটী সন্তান হয়, তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক রূপ বড়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানা গেল, তাঁহার স্ত্রী গর্ভাবস্থায় যে খাটে শয়ন করিতেন সেই খাটের পায়ের দিকে একটা উচ্চ টেবিলের উপর, একটা বড় বোতলে স্পিরিটের ভিতর একটী ভ্রূণ ছিল। তিনি যখনই শয়ন করিতেন তখনই এই ভ্রূণ তাঁহার চক্ষের উপরে পড়িত এবং তিনি মনে মনে ভাবিতেন "এই ভ্রূণ বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে এর চক্ষু কত বড় হইত।" তিনি বলিয়াছেন, "আমি যখনই শয়ন করিতাম, তখনই ভ্রূণের চক্ষু বড় হইবার কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ঐ ভ্রূণের দিকে অনেক সময় তাকাইতাম।"

উপরের ঘটনাদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে পিতা মাতা উভয়ের মানসিক ভাব সন্তানের কেবল মন গঠনের উপরই কার্য্য করে তাহা নহে, দেহ গঠনের উপরও যথেষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে। নিম্নে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা Dr. John Cowan এর The Science of New Life নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে গর্ভবস্থায় মনোযোগের সহিত কোনও চিত্রদর্শনের দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের দেহগঠন কিরূপ নিয়ন্ত্রিত হয়।

'A gentleman had hanging in his room a beautiful portrait, of which a friend, as he entered the room, when this gentleman's child

was sitting in it, exclaimed, "Why, what a fine likeness that is of your child." "No", replied the gentleman, "The child is the likeness of the picture," "How so?" inquired his friend. It proved that the mother of the child had so intensely kept the image of the picture in her mind and looked at it so much and so admiringly during her pregnancy that it reflected its beauties upon the young child's face.'—The Science of New Life.

এক ভদ্রলোকের ঘরে একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ টাঙ্গান ছিল। একদিন গৃহস্বামীর শিশুসন্তান সেই ঘরে বসিয়াছিল এমন সময় জনৈক বন্ধু ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ছবিখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাঃ, ছবিখানি ঠিক তোমার ছেলের মতনই হইয়াছে।" গৃহস্বামী উত্তর করিলেন "না, তাহা নহে, ছেলেটিই ছবিখানির মত হইয়াছে।" বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কিরূপ?" জানা গেল যে শিশুটির মাতা গর্ভাবস্থায় উক্ত ছবিখানির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ বিষয় সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতেন এবং তাঁহার এইরূপ একগ্রতার ফলেই ছবিখানির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার শিশুর মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মানসিক স্বাস্থ্য—

গর্ভাবস্থায় কুৎসিৎ চিন্তা করা অথবা কুক্রিয়াসক্তি থাকা গর্ভিণীর ও গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষে অতি অমঙ্গলজনক। দেখা গিয়াছে পিতামাতার মনের ভাব, বিশেষ করিয়া মাতার মনের প্রকৃতি সন্তানে প্রতিফলিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—The pregnant woman should be shielded from morbid sensations, evil influences or unpleasant sights and relieved of depressing forebodings as to the state of the unborn infant. অত্যধিক উত্তেজনাপূর্ণ নাটক নভেল পাঠে চিত্তচাঞ্চল্য হইয়া ভ্রূণের ক্ষতি হইয়া থাকে।

সুশ্রুত সংহিতায় নিম্নলিখিত উপদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

"গর্ভিণী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে হৃষ্টচিত্তা, অলঙ্কৃতা, শুক্লবস্ত্রপরিহিতা ও ধর্ম্মপরায়না হইবে। মলিন, বিকৃত বা অঙ্গহীন লোককে দর্শন বা স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ পদার্থ ব্যবহার করিবে না এবং যে সকল পদার্থ দর্শনে ঘৃণা বা ভয়ের সঞ্চার হয় এরূপ পদার্থ কখনও দর্শন করিবে না। চিত্তের উদ্বেগ জনক কোনরূপ আলাপ করিবে না। কদাচ দূষিত জিনিষ আহার করিবে না। শ্মশানে গমন, দূরদেশে ভ্রমন, শূন্য গৃহে বাস সর্ব্বদা

পরিত্যজ্য। ক্রোধ ও ভয়ের কারণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। ভার বহন, লম্ফ প্রদান প্রভৃতি যাহাতে গর্ভপাত হইতে পারে এমন কার্য্য নিষিদ্ধ। কোমল অথচ সুখকর শয্যা ব্যবহার করিবে; মধুর প্রিয়দ্রব্য, তরল, অগ্নিকর ও সিদ্ধ দ্রব্য আহার করিবে।”

গর্ভাবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য যাহাতে খুব ভাল থাকে, রক্তহীন না হইয়া পড়ে তজ্জন্য আহারাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা পরিবারস্থ লোকের বিশেষ কর্ত্তব্য। যে যে নিয়ম প্রতিপালন করিলে সুসন্তান লাভ করা যায় তাহা উল্লেখ করা গেল। আমাদের দেশের শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র উভয়ের মতের এ বিষয় বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যদি আমাদের দেশের মায়েরা এই সকল উপদেশ প্রতিপালন করেন তবেই কবির এই আক্ষেপোক্তি দূর হইবে :—

“সাত কোটী সন্তানের হে মুগ্ধজননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।”

সাধ ভক্ষণ—

আমাদের দেশে গর্ভবতী নারীদের জন্য সাধ ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথা বাস্তবিকই উপকারী। গর্ভাবস্থায় অনেক গর্ভিণীর নানাপ্রকার জিনিষ খাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়, এই ইচ্ছা পূর্ণ করিলে মন প্রফুল্ল হয়। এই জন্য পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত, সপ্তম মাসে সপ্তামৃত এবং নবম মাসে পাকা সাধ দেওয়া হয়। আত্মীয় স্বজনেরা নানা

স্থান হইতে এই সব সময়ে নূতন কাপড়, নানাপ্রকারের খাবার গর্ভিণীর জন্য পাঠাইয়া থাকেন। গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা এবং তাহার মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য এই সাধ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শক্তিমান সন্তান লাভের উপায়—

দীর্ঘজীবী, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান, শক্তি-শালী ধার্ম্মিক সন্তান সকল পিতা মাতাই কামনা করেন। কি কি উপায়ে সুস্থ সবল সন্তান লাভ করা যায়, উপরে লিখিত হইল ; কিন্তু এসকল সত্ত্বেও বলবীর্য্যশালী, শক্তিমান সন্তান লাভ করিতে হইলে পিতা ও মাতার পরস্পরের মনের গভীর ভালবাসা, প্রীতির আকর্ষণ সর্ব্বোপরি প্রয়োজন, অন্যথা তাঁহারা কখনও সুসন্তান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।

গর্ভপাত—

গর্ভসঞ্চারের পর ৬ মাসের ভিতর কোন কোন গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়া যায়। সাধারণতঃ ৩য় মাসে বেশী গর্ভপাত হয়। যাহাদের একবার গর্ভস্রাব হয় তাহাদের বার বার গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকে, এবং অনেকবার গর্ভপাত হইতে দেখা যায়। গর্ভিণীদের প্রথম প্রথম ৩মাস পর্য্যন্ত জরায়ুর মুখ একবারে বন্ধ হয় না, তজ্জন্য কখন কখন কোন কোন গর্ভিণীর অল্প রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, ইহাতে কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। যদি অতিরিক্ত স্রাব, উক্ত স্রাবে চাপ

চাপ রক্ত থাকে, কোমরে বেদনা অথবা প্রসব বেদনার মত বেদনা হয় তবে গর্ভপাতের আশঙ্কা জানিয়া অবিলম্বে সুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে। ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে—

(১) গর্ভিণীকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া পাছার নীচে একটা বালিশ দিয়া রাখিবে যেন মাথার দিকটা নীচু হয়। এবং রক্তস্রাব ভাল করিয়া বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে, মল, মূত্র ত্যাগের সময়ও উঠিয়া বসিতে দিবে না।

(২) বরিক তূলা (Boric cotton) বা পরিষ্কার নেকড়া গরম জলের ভিতর আধ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া, জল ভালরূপ নিংড়াইয়া প্রসবদ্বারে ঠাসিয়া দিবে। যদি স্রাবে ভিজিয়া না যায় তবে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নেকড়া ঐ ভাবে থাকিবে, ভিজিয়া গেলে বাহির করিয়া আবার নূতন নেকড়া দিবে।

নিম্নলিখিত কারণে গর্ভপাত হয়, অতএব এই সকল বিষয়ে সাবধান হইবে।

(১) তলপেটে আঘাত লাগা, (২) ভারী বস্তু উত্তোলন, (৩) আছাড় পড়া, (৪) গাড়ীতে চড়া, (৫) স্বামী সহবাস, (৬) ভয় ও শোক, (৭) স্বামীর প্রমেহ, গরমীর (সিফিলিস) ব্যারাম, (৮) গর্ভিণীর প্রদর রোগ, (৯) বাধক বেদনা, (১০) রক্তহীনতা এবং (১১) ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, আমাশয়, অজীর্ণ, প্রবল জ্বর, হাম, বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ।

সিফিলিস (গরমি)—

চরিত্রহীন স্বামীর সংস্পর্শে অনেক মেয়ের এই কুৎসিত ব্যাধি হয়। একবার এই বিষ দেহে প্রবেশ করিলে ১ যুগ পর্য্যন্ত ইহার বিষক্রিয়া শরীরের উপর কার্য্য করে, এবং পুরুষের এই বিষ স্ত্রী ও সন্তানের ভিতর সংক্রামিত হইয়া বংশ পরম্পরা এই ঘৃণিত ব্যাধি সমগ্র পরিবারকে নষ্ট করে। যে সকল পুরুষের এই ব্যাধি থাকে, তাহাদের সন্তানোৎপাদনের শক্তি কমিয়া যায়, সন্তান হইলেও অনেক স্থলে গর্ভপাত বা গর্ভে সন্তান মারা যায় এবং তৎসঙ্গে জরায়ুর নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি হয়। পুরুষের এই ব্যাধি হইলে রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করা উচিত নয়। বিবাহিত পুরুষকে ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গলের জন্য রোগ ভাল রূপ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রীর পৃথক অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

গণোরিয়া (প্রমেহ)—

এই ব্যাধিতে পুরুষের প্রস্রাব নালীতে ঘা হইয়া পুঁজের মত স্রাব হয়, প্রস্রাবে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা হয়। অনেক নিরপরাধিনী স্ত্রী স্বামীর এই ঘৃণিত ব্যধির জন্য চিরকাল কষ্ট পান। এই প্রকার পুরুষেরও সন্তানোৎপাদনের শক্তি কমিয়া যায়। প্রমেহগ্রস্ত পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক স্ত্রী চিরদিনের জন্য বন্ধ্যাও হইতে পারে, অথবা সন্তান হইলেও গর্ভপাত হয়।

শ্বেত প্রদর (লিউকোরিয়া)

এই রোগে মেয়েদের প্রসব পথ দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত চুণের জলের মত সাদা স্রাব হয়। এই রোগগ্রস্ত মেয়েদের গর্ভ হইলে অনেক সময় গর্ভপাত হয়। সুতিকা জ্বর এবং জরায়ুর ভিতর ঘা হইয়া অনেক গর্ভিণী মারা যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রদরের স্রাব সন্তানের চক্ষে লাগিয়া সন্তান আঁতুড় ঘরেই অন্ধ হইয়া যায়। মেয়েদের এই অসুখ থাকিলে ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবে, অন্যথা চিরজীবন কষ্ট পাইতে হইবে।

মেয়েদের বন্ধ্যা হইবার এবং গর্ভপাতের কারণ বর্ণনা করা হইল। সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক নরনারীর এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রসবের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য

ঋতু স্নানের ৬ দিন হইতে ১২ দিনের ভিতর সাধারণতঃ গর্ভ সঞ্চারের কাল, এই সময় হইতে ২৮০ দিনে (৯ মাস ১০ দিন) সন্তান প্রসব হয়।

ইংলণ্ডে ১০০০ শিশুর ভিতরে গড়ে শিশু মৃত্যু ৭০, বাংলায় মরে ১০০০ হাজারের ভিতর ১৮২ জন অর্থাৎ ইংলণ্ড

হইতে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যু ৩ গুণ বেশী। বাংলা দেশে প্রত্যেক দিন ৮১৬টী শিশু মায়ের কোল শূন্য করিয়া অকালে পরলোকে গমন করে।

প্রসূতির মৃত্যু—

প্রসূতিমৃত্যু সংখ্যা বিলাতে ২০০০ হাজারের ভিতর ১ এবং আমাদের দেশে ৪০ এর ভিতর ১ অর্থাৎ বিলাত হইতে ৫০ গুণ বেশী।

এই অকাল শিশুমৃত্যু ও মাতৃহত্যার জন্য আমাদের দেশের লোকের ভিতর তেমন কেন প্রকার আন্দোলন নাই। ইহার কারণ এ দেশের মজ্জাগত অদৃষ্টবাদ। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে" বচনের কথা স্মরণ করিয়া আমরা ভীষণ শিশু ও মাতৃমৃত্যুজনিত শোক সম্বরণ করিয়া থাকি। কিন্তু একটী বার ভাবিয়া দেখি না বিলাতের শিশুমৃত্যু এত কম কেন? আমাদের দেশের শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যুর কারণ,—(১) আঁতুড় ঘর, (২) অপরিষ্কার বিছানা (৩) অশিক্ষিতা ধাত্রী (৪) অজ্ঞানতা (৫) অল্প বয়সে মাতৃত্ব (৬) আর্থিক অভাব। ভারতের এই ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্য, শিশুমৃত্যুর একটী প্রধান কারণ।

এই ষড়রিপুই অকাল শিশুমৃত্যুর কারণ। ইহাদের দূর করিবার জন্য সমগ্র জাতির বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

আঁতুড় ঘর—

আঁতুর (আতুড়) শব্দের প্রকৃত অর্থ অসমর্থ বা চলিতে

অক্ষম, অস্পৃশ্য নহে। প্রসবের পরে মাতা সর্ব্বপ্রকার কাজ কর্ম্মে অসমর্থ হন, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত রোগীর ন্যায় তাঁহাকে ১ মাস কাল শয্যাশায়ী হইয়া পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এই ১ মাস কাল তিনি যে ঘরে বাস করেন তাহাকে সেবাসদন (হাঁসপাতাল) বলাই আঁতুড় শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য। হাঁসপাতালের বিশুদ্ধতার উপর যেমন রোগীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে, আঁতুড় ঘরের বিশুদ্ধতার উপরও তেমনি মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে প্রসবের জন্য কোন স্থায়ী ঘর থাকে না। প্রসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে, কোথাও বা প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে বাড়ীর আঙ্গিনার ভিজা স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে ভাঙ্গা চাটাই প্রভৃতি দ্বারা অতি কদাকার আঁতুড় ঘর নির্ম্মিত হয়। ঘরের ভিটী থাকে না, ঘরে কোন প্রকার জানালাও রাখা হয় না। সহরে যেখানে ধনী লোকেরা বড় বড় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করেন, সেখানেও বাড়ীর নীচের তলায় অল্প পরিসর অন্ধকার, আলো বাতাস বিহীন ঘর বরাবর প্রসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়। সমস্ত বৎসর ঘর বন্ধ থাকার জন্য ঘর অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে ও আরশুলার বাসগৃহ হইয়া থাকে—প্রসবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ঐ ঘরের দরজা খুলিয়া প্রসূতিকে সেই নরককুণ্ডসদৃশ স্থানে প্রবেশ করান হয়। এই যমালয় সদৃশ ঘরে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং কয়েকদিন অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে বিশেষতঃ সূতিকা

ঘরে সর্ব্বদা আগুন জ্বালাইয়া রাখার জন্য ধুঁয়ায় বায়ু দূষিত থাকায় ঐ দূষিত বায়ু সেবনে সদ্যজাত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ঘরের গৃহিণীরা সূতিকা ঘর অস্পৃশ্য এবং সেই ঘরের বিছানা ইত্যাদি পরিত্যজ্য বলিয়া আঁতুড়ের জন্য যত নোংরা কাঁথা ছেঁড়া মাদুর সঞ্চিত করিয়া রাখেন, তার ভিতর ধূলা ময়লা জমিয়া থাকে এবং তাহাতে নানাপ্রকার ব্যাধির জীবাণু থাকে তাহা প্রসূতি ও শিশুর শরীরে লাগিয়া নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করে।

আমরা এই প্রকারের আঁতুড় ঘরের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই মহিলা সভায়, শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীতে বক্তৃতা করিয়া আসিতেছি। লোকের ধারণা, আমরা প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটা সাহেবী মত প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের শুচিতার বিরুদ্ধে বলিতেছি। তজ্জন্য প্রথমে আর্য্য ঋষিদের প্রণীত চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করিব।

মহর্ষি আত্রেয় লিখিয়াছেন,—

"প্রাক্ চৈবাস্যা নবমান্মাসাৎ সূতিকাগারং কারয়েদপহৃতাস্থি শর্করা কপালে দেশে প্রশস্তরূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ প্রাপ্ দ্বার মুদগ দ্বারং বা।"

অর্থাৎ গর্ভিণীর নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকা গৃহ প্রস্তুত করিবে। সে স্থান হইতে অস্থি শর্গরা (কাঁকর) কপাল

(খাপরা) প্রভৃতি আবর্জ্জনা অপসরণ করাইবে। আর সূতিকাগৃহের মৃত্তিকা উৎকৃষ্টরূপ ও উত্তম গন্ধযুক্ত হওয়া উচিত। সূতিকা গৃহের দ্বার দক্ষিণ দিকে অথবা পূর্ব্বদিকে করা কর্ত্তব্য।

"তত্র বৈল্বানং কষ্ঠানাং—"

অর্থাৎ "সেই গৃহের পিড়ি, খাট, বেড়া এবং কপাট ইত্যাদি বিল্ব, তিন্দুক (গাব) ইঙ্গুদ (বাদাম), বরুণ (যজ্ঞডুমুর) এবং খদির এই সমুদায়ের কাষ্ঠ নির্ম্মিত হওয়া উচিত এবং গর্ভিণীর নিমিত্ত মলমূত্র পরিত্যাগের স্থান, স্নানের ভূমি এবং রন্ধন গৃহ প্রস্তুত করাইবে।"

"ততঃ প্রবৃত্তে নবমে মাসে—"

অর্থাৎ "তাহার পর নবম মাসে শুভদিনে শান্তিসস্তায়ন ইত্যাদি দেবারাধনা সুসম্পন্ন করিয়া পবিত্র মনে গর্ভিণীকে সূতিকাগারে প্রবেশ করিতে বলিবে। গর্ভিণী প্রসবকাল পর্য্যন্ত ঐ গৃহে প্রশান্ত চিত্তে বাস করিবেন"।

সূতিকাগৃহে কি কি দ্রব্য রাখিবে মহর্ষি আত্রেয় "তয়া শ্মানৌ"—ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। "সূতিকাগৃহে শিল, নোড়া, উদূখল, গাধা, গরু, সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দুইটী তীক্ষ্ণ সূচী এবং লৌহ নির্ম্মিত কয়েকটী তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, সূতা, বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিত দুইখানি পর্য্যাঙ্ক, অগ্নি জলিয়া রাখিবার জন্য তিন্দুক ও ইঙ্গুদ কাষ্ঠ রাখিবে। এতদ্ভিন্ন যে সমুদয় স্ত্রীলোক অনেকবার সন্তান

প্রসব করিয়াছেন এরূপ প্রিয়দর্শন, অভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, কর্ম্মঠ, ক্লেশসহিষ্ণু স্ত্রীগণ সর্ব্বদা নিকটে থাকিবে। গর্ভিণীর মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এমন কথা বলিবে না।”

বিখ্যাত সিবিল্ সার্জ্জন্, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু এম. ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন—“শাস্ত্র মতে সূতিকাঘর মনোহর হওয়া উচিত; কিন্তু আধুনিক সূতিকাগৃহে এমন কোন পদার্থ বা গুণ দৃষ্ট হয় না যাহাতে প্রসূতির মন আকৃষ্ট হয়, বরং তিনি কখন ঐ গৃহ হইতে বাহির হইবেন এই চিন্তাতেই অস্থির থাকেন, কিন্তু বাস্তবিকই ঐ গৃহ মনোহর হওয়া উচিত। কারণ মানসিক কষ্ট হইলে নানা প্রকার গুরুতর পীড়া জন্মে। সূতিকাগৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত হইলে ১০×১২ হস্ত এবং কাঁচা হইলে ১০×৬ হস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক; উহার ভিটা উচ্চ, শুষ্ক, এবং উহা দরজাজানালাবিশিষ্ট এবং জনকোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত হইলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই মঙ্গলকর হয়।”

আঁতুড়ঘরের দোষে মৃতশিশুদের ভিতর শতকরা ১১ জন আঁতুড়ঘরে প্রসবের ৬ দিনের ভিতরে মারা যায়। দেশপ্রচলিত বর্ত্তমান সূতিকগৃহকে সাক্ষাৎ যমালয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা দেশের প্রচলিত এই সকল আঁতুড়ঘরকে হিন্দুর সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের দিক দিয়া সমর্থন করিতে চান, তাঁহারা হিন্দু-সভ্যতা

ও সমাজের সজীবতার সময়ের হিন্দুধর্ম্মের সংহিতাকার আর্য্যঋষিদের ব্যবস্থার বিষয়ে যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহা চরক ও সুশ্রুতের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। তাঁহারা সূতিকাগৃহকে দেবগৃহ, সূতিকাগৃহকে শান্তি ও আনন্দের আলয়, মনোরম ও পবিত্র গৃহ বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। হায়! হায়! তোমরা তাহা ভুলিয়া গিয়া, শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিয়া ইহাকে অস্পৃশ্য, কদাকার যমালয় করিয়া তুলিয়াছ। এই জন্যই প্রতি বৎসর প্রায় তিনলক্ষ শিশু মরিতেছে। তাই দুঃখ করিয়া বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

অকাল শিশুমৃত্যুতে
ও
সহজে নিবার্য্য নানা ব্যাধিতে
কত মাতৃক্রোড় শূন্য
ও
গৃহ সুখহীন
আবার
সমাজ ও জাতি
হীনবল ও পরাধীন।

আঁতুড় ঘর কি অস্পৃশ্য?

"আঁতুড় ঘরে যেও না" এই নিষেধ বিধির জন্য বোধ হয়

আঁতুড় ঘর অস্পৃশ্য এই ভাব আসিয়াছে, এটা ঠিক "উল্টা বুঝিলি রাম" এই প্রবাদ বচনের মত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমরা সকল অবস্থায় বিশেষতঃ অপবিত্র কাপড়ে অশুচি দেহে ঠাকুরঘরে যাইতে নিষেধ করি, বলি—ইহাতে পাপ হয়, কেননা ঠাকুরঘর পবিত্র। তেমনি সূতিকা গৃহও পবিত্র স্থান। শিশু যে গৃহে বাস করিতেছে তাহাকে ঠাকুরঘরের মত জ্ঞান করা উচিত। বিশেষতঃ, শিশুর শরীর দুর্ব্বল, তুমি রাস্তা, ঘাটে, বাজারে যে কাপড়ে গিয়াছ, তাহা লইয়া যদি শিশুর কাছে যাও তবে অপরিস্কার কাপড়ের ভিতর যে নানা প্রকার দূষিত বাষ্প ও রোগজীবাণু (রোগেরবিষ) লুক্কাইত আছে তাহা শিশুকে আক্রমণ করিয়া ব্যাধিগ্রস্থ করিবে। এই জন্যই শিশুর পবিত্র গৃহে যখন তখন যেমন তেমন কাপড়ে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, আমরা উল্টা বুঝিয়া পবিত্র দেবগৃহসম শিশুর গৃহকে, সংস্কার বশতঃ অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছি। অতএব দেশবাসীর কাছে সানুনয় নিবেদন, আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী আঁতুড় ঘরের সংস্কার দ্বারা শিশুমৃত্যু নিবারণ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।

সূতিকা গৃহকে অস্পৃশ্য মনে করার কি কুফল হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—

একবার উত্তর বঙ্গের কোন এক জমিদার বাড়ীতে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে শিশু মৃত্যু নিবারনের উপায় বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবার পর, জমিদার বাবুদের বড় ভ্রাতা, আমার

কাছে আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আপনি যদি আরও ৪ মাস পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে বক্তৃতা করিতেন, তবে আমার কন্যা ও তার সদ্য জাত শিশু পুত্রটীর মৃত্যু হইতনা, আমি পরিস্কার বুঝিতেছি, ঐ সিড়িকোঠার অপরিস্কার, অল্প পরিসর আঁতুড় ঘর, ময়লা বিছানা, এবং দাই আমার কন্যা ও দৌহিত্রের মৃত্যুর কারণ"।

ইহার প্রায় ৩ বৎসর পর উক্ত জেলার টাউনহলে শিশু মঙ্গল বিষয় বক্তৃতা করার পর, একটী যুবক আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিয়া বলিল "আপনি···জমিদার বাবুদের বাড়ী এই বিষয়ে বক্তৃতা করার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম, ৬ মাস পূর্ব্বে আমার একটী সন্তান হয়, আপনার উপদেশ মত এবার সূতিকা ঘর, বিছানা ও দাইদের ব্যবস্থা করার ফলে, সন্তান ও তার মাতা সুস্থ আছে। ইতি পূর্ব্বে আমার দুইটী সন্তান হইয়াছিল, উভয়েই সূতিকাঘরে মারা যায় এবং প্রসূতি দীর্ঘকাল সূতিকায় ভুগিয়াছিল, আমাকে এ কাজ করিতে সমাজে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন অনেকেই আমার দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সূতিকা ঘর ইত্যাদি করিতেছে"

অনেক বিচার বুদ্ধিহীন তার্কিক ব্যক্তি হয়ত বলিবেন, "মহাশয় ; দেশের লোক খাইতে পায়না, কি প্রকারে ব্যয়সাধ্য আতুড় ঘর করিবে!" আমি তাঁদের কাছে সানুনয় নিবেদন করিতে চাই, সুশ্রুত বা চরকের মত অনুসারে অথবা

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করা দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব না হইলেও প্রত্যেকেইত একখানা আঁতুড় ঘর করিয়া থাকেন। উহা ১০ হাত দীর্ঘ ৭ হাত প্রশস্ত করা পল্লীগ্রামে এমন কিছু কঠিন নহে, উহার ভিটী দেড়হাত উচ্চ করা একেবারেই ব্যয়সাধ্য নয়; কেন না পল্লীগ্রামে মাটীর কোন অভাব নাই। উহার বেড়া বিল্ব, গাব, যজ্ঞডুমুর কাঠের করা সম্ভব যদি নাও হয়, তবে যেসব চাটাইগুলির দ্বারা বর্ত্তমানে বেড়া দেওয়া হয় তাহা পূর্ব্বে জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়া গোময় ও মাটীর দ্বারা অনায়াসেই লেপিয়া শুকাইয়া দিতে পারেন, এবং ৪টী জানালা ও একটী দরজা করিতে কিছুমাত্র বাধা নাই। ইহা ব্যয়সাধ্য নয় কিন্তু পরিশ্রম সাধ্য বটে। আমার ভবিষ্যৎ বংশধর যাহার উপর আমার সকল আশা ভরসা, যে আমার গৃহের আনন্দদায়ক হইবে অথবা কে জানে কোন মহাপুরুষ আমার গৃহে আবির্ভূত হইবেন, তাহার প্রতিক্ষায় এইটুকু কষ্ট স্বীকার করা কি উচিত নয়?

নবম মাসের পূর্ব্বে ঘরখানা করিলে প্রসবের সময়ে বেশ শুষ্ক খটখটে হইবে, এবং শুভদিনে ভগবানের পূজা আরাধনান্তে গর্ভিনীকে উক্তগৃহে আনয়ন করিলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ হইবে। আঁতুড় ঘর পাকা হইলে তাহাতে যথেষ্ট দরজা জানালা থাকা বিশেষ প্রয়োজন, প্রসবের পূর্ব্বে উক্ত ঘর ভাল করিয়া চুনকাম করিয়া নিবে এবং যাহাতে স্যাঁতসেঁতে না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

আঁতুড়ের বিছানা ঃ—

আঁতুড়ের বিছানা কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে আঁতুড়ের বিছানা ফেলিয়া দেওয়া হয় বলিয়া আঁতুড়ে যত ময়লা ও ছেঁড়া কাঁথা কাপড় দেওয়া হয়। যদি ফেলিয়া দিতেই চান আপত্তি নাই, যদি ছেঁড়াও হয়, আঁতুড়ে দিবার পূর্ব্বে সমস্ত কাঁথা কাপড় সোডায় সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কাঁথা ও কাপড়ে ময়লা থাকিলে, তাহাদ্বারা প্রসূতি ও শিশু উভয়ে রোগাক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহারা প্রসূতির জন্য নূতন পরিষ্কার তোষক, বিছানার চাদর ২ খানা, বালিশ, মশারী, গায়ে দিবার জন্য পাতলা কম্বল বা কাঁথা (শীতকালে লেপ) অয়েল ক্লথ, ২খানা খাট (একখানা প্রসূতির, একখানা শিশু ও ধাত্রীর জন্য) রাখিবেন। দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে খাট সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ কাঠের অথবা বাঁশের মাচা করিয়া নেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। প্রসূতি ও শিশুকে কখনই মাটীতে শোয়ান উচিৎ নহে, মাটীতে শুইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া উভয়েরই অসুখ করিবে। ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে এই সময় শিশুদিগের সর্দ্দি ও প্রসূতির প্রবল সূতিকার জ্বর হয়। শিশুদের পক্ষে সর্দ্দি অতিশয় মারাত্মক ব্যাধি।

সূতিকাঘরে ঔষধপত্র রাখিবার জন্য একখানা টেবিল,

অন্ততপক্ষে দেওয়ালে একটী ঝুলান তাক করিয়া, তাহার উপরে ঔষধপত্র রাখিবেন।

রাত্রে জ্বালিবার জন্য ডুমওয়ালা চর্ব্বির বা রেড়ির তৈলের বাতী রাখিবে, খোলা বাতী রাখিলে ধাত্রীর অসতর্কতা বশতঃ ঘরে আগুন লাগিয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। সূতিকা ঘরে কখনই কেরাসিনের আলো ব্যবহার করিবেনা।

প্রসব গৃহের সংলগ্ন একটী স্থান ঘিরিয়া, তার ভিতর মল মূত্র পরিত্যাগের জন্য বেড্‌প্যান্ পট প্রভৃতি রাখিয়া দিবে (এই সকলের অভাবে মাটীর মালসা ব্যবহার করা যাইতে পারে)। অনেক দেশে রাত্রে সূতিকাঘরের দরজা খোলা হয়না, প্রসূতির স্রাবের ন্যাক্‌ড়া, মল, মূত্র প্রভৃতি আঁতুড় ঘরের ভিতর থাকায় ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়, সূতিকাঘরের এই সকল ময়লা তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করার জন্য, আঁতুড় ঘরের সংলগ্ন একটী স্থান ঘেরিয়া রাখা ভাল।

এমন কোন কোন সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা ৬দিন পর্য্যন্ত আঁতুড় ঘর হইতে কোন জিনিষ বাহির করেননা। প্রসবের পর একটা সড়ার ভিতর ফুল (প্লেসেন্টা) রাখিয়া দেয় এবং প্রসূতির সকল প্রকার স্রাব, মল, মূত্র ঐগৃহে সঞ্চিত থাকে; তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়া দূষিত হাওয়ার সৃষ্টি করে, অসংখ্য পিপিলিকার আগমনে ও দংশনে প্রসূতি ও সন্তান অতিষ্ঠ হইয়া ৬দিন পর্য্যন্ত এই নরক সদৃশ গৃহে ভীষণ যাতনা সহ্যকরিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহা অতিশয়

দূষনীয় প্রথা, সূতিকাগৃহ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য, সূতিকাঘরের সংলগ্ন একটী ঘর থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

অশিক্ষিতা ধাত্রী ঃ—

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ধাত্রীর নিকটেই আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ধাত্রীর সাবধানতা ও অসাবধানতা, শিক্ষা ও অশিক্ষা, সহৃদয়তা ও নিষ্ঠুরতার উপর তার জীবন মরণ নির্ভর করে, কেননা শিশু তখন সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল, এমনকি স্নেহময়ী জননীও তখন আপন সন্তানের ভার গ্রহণে অশক্ত। অতএব কিরূপ ধাত্রী হওয়া প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পল্লীগ্রামে এইরূপ আদর্শ ধাত্রী অতিশয় বিরল, সুহরেও ইহাদের সংখ্যা খুব অল্পই আছে, এবং সহরে থাকিলেও অনেক সময় গৃহকর্ত্তা ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে সহরের এক শ্রেণীর অশিক্ষিতা চামারনী দাইকে ডাকেন, পল্লীগ্রামের তো কথাই নাই। এই সকল দাইদের কোনপ্রকার শিক্ষা নাই। অভিজ্ঞতাবশতঃ সহজ প্রসব করাইতে ইহারা সমর্থ হইলেও ইহারা প্রসবকালীন সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতা বিষয়ে অনভিজ্ঞ। ইহারা বেশ অর্থ উপার্জ্জন করে বলিয়া ইহাদের হাতে আংটী, বালা ও নানাবিধ চুড়ির বাহুল্য দেখা যায়, ইহার ভিতর নানা-প্রকার ময়লা ও বিষ সঞ্চিত থাকে। হাঁতের নখ হয়ত বড়, তার ভিতর ময়লা জমিয়া আছে, এবং পরিধানে ময়লা কাপড়। ইহারা নাড়ী কাটিবার জন্য বাঁশের চেঁচারী অথবা ধারশূন্য

ময়লা কাঁচি বা ছুরি, নাড়ী বাঁধিবার ময়লা সূতা, ব্যবহার করে। অপরিষ্কার নানাবিধ রোগজীবাণুপূর্ণ হাত প্রসবকার্য্যে ব্যবহার করার ফলে ঐ সকল বিষ মায়ের নাড়ীতে ও শিশুগাত্রে লাগিয়া তাহাদের রক্ত দূষিত হয় এবং ময়লা অস্ত্রে বা বাঁশের চেঁচারির দ্বারা নাড়ী কাটিবার সময় তাহাতে যে বিষ থাকে তাহা শিশুর রক্তে মিশিয়া তাহার দেহস্থ রক্তকে দূষিত করে। ইহার ফলে শিশু ধনুষ্টঙ্কারব্যাধিগ্রস্ত হয়। সে ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিয়া উঠে, বুক উচু হইয়া উঠিয়া একেবারে ধনুকের মত হয়। শিশু একবার সাদা, একবার সবুজরং বিশিষ্ট হয়। লোকে ইহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বা "ভূতেধরা বলে" অশিক্ষিতা দাইই সেই ভূতের দূতী স্বরূপ হয়। গর্ভিণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে গৃহস্থের কর্ত্তব্য যেখানে শিক্ষিতা ধাত্রী পাওয়া যায় সেখানে অবশ্য তাহাকে ডাকা "এসময় কৃপণতা বোকামীর পরিচায়ক।" যদি শিক্ষিতা ধাত্রী নাই পাওয়া যায়, তবে বহুদর্শিনী, কার্য্যকুশলা দাইকে ডাকিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহার হাতের চুড়ি, বালা, আংটী খুলিয়া ফেলিবে, নখ বড় থাকিলে কাটাইবে, এবং ব্রাস অথবা খসখসে কাপড় দিয়া আঙ্গুলের মাথা ও হাত খুব ভাল করিয়া রগ্‌ড়াইবে, এবং সাবান দ্বারা বেশ করিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইবে। তৎপর প্রসবকালীন কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য ধাত্রীকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

অজ্ঞানতার জন্য যে যে অনিষ্ট হয় উল্লেখ করা গেল,

অকাল মাতৃত্বের জন্য বাংলা দেশের শিশুমৃত্যুর বিষয় পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

দাইয়ের থলি—

এদেশের দাইরা প্রসব কালে ব্যবহারের জন্য ছুরী কাঁচি, সূতা প্রভৃতি সঙ্গে যাহা নিয়া আসে তাহা অপরিষ্কার এবং যে পাত্রে নিয়া আসে তাহার মধ্যে নিজের ব্যবহার্য্য পান, দোক্তাও থাকে। কাজেই দাইয়ের কঁচি সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। গৃহস্থের নিজেদেরই তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা ভাল। কিন্তু প্রত্যেক দাইয়ের সঙ্গে একটী স্বতন্ত্র ব্যাগ থাকা কর্ত্তব্য এবং ঐ সকল ব্যাগের ভিতর প্রসবকালীন ব্যবহার্য্য কাঁচি, সূতা, সাবান, লাইসোল, টিংচার আইডিন্, বোরাসিকতুলা প্রভৃতি রাখা উচিত। প্রত্যেক গৃহস্থ এরূপ একটী ব্যাগ ক্রয় করিয়া অনায়াসে রাখিতে পারেন। (৭০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর অফিসে ঐ ব্যাগ বিক্রয় হয়)।

দাই শিক্ষা কেন্দ্র—

বাংলা গভর্ণমেণ্টের 'স্বাস্থ্যবিভাগ' বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা ধাত্রীদিগকে প্রসবকালীন কর্ত্তব্য, শিশু পালন, প্রসূতির শুশ্রূষা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১৭৫টী ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধাত্রীদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। ইহা দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। ইউনিয়ান বোর্ড, পল্লীসমিতি সমূহের কর্ত্তব্য

এই প্রকার ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা অথবা নিকটবর্ত্তী ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্রে অশিক্ষিতা ধাত্রীদের পাঠাইয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগ দেশের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অকাল মাতৃত্ব—

১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মেয়েদের সন্তানের মা হওয়া শরীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে বাঞ্ছনীয় নহে। মায়ের শরীরের পূর্ণতা হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার শোণিত হইতে জাত সন্তান কি প্রকারে সুস্থ ও সবল হইবে? দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে আজও বালিকারা অপরিণত বয়সে বিবাহিত হয়। অতি অল্প বয়সে শিশুকন্যারা যখন পিতামাতার ক্রোড়ে আনন্দে বিচরণ করিবে, সেই বয়সে পরের গৃহে বধূ হইয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া স্বাভাবিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। এমন কি কোন কোন মেয়ে ১২।১৩ বৎসরে গর্ভবতী হয়, এই অকাল মাতৃত্ব শিশুমৃত্যুর একটী প্রধান কারণ। যত দিনে বাংলার হিন্দু-সমাজের এই সামাজিক প্রথার সংস্কার না হইবে, ততদিন শিশুমৃত্যু নিবারণ হইবে না।

বংলাদেশে কত অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

১৯২১ সনে লোকগননায় স্থির হইয়াছে, বাংলা দেশে, হিন্দু সমাজে নিম্ন লিখিত বিভিন্ন বিয়সের কত বধূ আছে।

বয়স	শিশু ও বালিকাবধূ
১ বৎসরের কম	২৮৩ ”
১—২ বৎসরের	৪১৭ ”
২—৩ ”	১,১১৬ ”
৩—৪ ”	২,৩৭৪ ”
৪—৫ ”	৩,৭৩৫ ”
৬—১০ ”	১,২১,১৭১ ”
১০—১৫ ”	৫,৬৫,৬৮৭ ”

আজও দেশের এই অবস্থা!

এই সামাজিক কুপ্রথা কি শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী নহে? দেশের মঙ্গলের জন্য এই অল্প বয়সে বিবাহ প্রথা নিবারণ করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রসবকালীন কর্ত্তব্য

প্রসববেদনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নবম মাসে নিম্নলিখিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

(১) নাড়ী কাটিবার ধারাল পরিষ্কার কাঁচি ১ খান।
(২) নাড়ী বাঁধিবার সূতা ২।৩ প্রস্ত টুকরা।
(৩) হাত ধুইবার কার্ব্বলিক সোপ্ ১ খান।

(৪) শিশুকে স্নান করাইবার ভাল সাবান ১ খান।

(৫) লাইসোল বা কার্ব্বলিক এসিড্ (লোসন করার জন্য) ১ শিশি।

(৬) টিংচার আইডিন্ ১ শিশি।

(৭) জিঙ্ক বোরিক পাউডার (নাভতে দিবার জন্য) ১ আউন্স।

(৮) বোরিক তুলা ১ প্যাকেট।

(৯) এনামেলের বাটি ২ টা।

(১০) শিশুকে স্নান করাইবার মাটির গামলা ২টী।

(১১) শিশুকে মাখাইবার নারিকেল তৈল ১ শিশি।

(১২) ক্যাষ্টর অয়েল ৩ আউন্স।

(১৩) অয়েল ক্লথ ২ গজ।

(১৪) উনান ১ টি।

(১৫) ডুস্ ১ টি।

(১৬) জল ফুটাইবার হাঁড়ী ১টা।

(১৭) বোরিক লোসন্ ২ আউন্স।

(১৮) কষ্টিক লোসন ১ আউন্স।

(১৯) আগুণ রাখার গামলা, কাঠের কয়লা, গুল ১ প্রস্ত

(২০) ছেলে ও পোয়াতীর ব্যবহারের উপযোগী কাপড়, পেট বাঁধিবার কাপড় (Binder)।

ইহা ব্যতীত ছেঁড়া পরিষ্কার কিছু ন্যাকড়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া একটী পরিষ্কার কাগজের বাক্সের

ভিতর রাখিয়া দিবে, প্রসবের সময় স্রাব ইত্যাদি ধরিবার জন্য আবশ্যক হয়। গ্রামে যেখানে বোরিক তুলা পাওয়া যায় না অথবা পয়সার অভাবে যাহারা ক্রয় করিতে অসমর্থ তাহারা বোরিক তুলার পরিবর্ত্তে ঐ সকল ধোয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া গরম জলের ভিতর ১৫-২০ মিনিট ফুটাইয়া বোরিক তুলার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবে। লাইসোল লোসন, অথবা কার্ব্বলিক এসিড্ লোসন সংগ্রহ করিতে না পারিলে অগত্যা গরম জল, তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবে।

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলেই ধাত্রীকে সংবাদ দিয়া আনিবে (ইহার পূর্ব্বে প্রসূতির সঙ্গে দাইয়ের পরিচয় হওয়া উচিত)। দাই যদি অশিক্ষিতা নোংরা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পরিষ্কার করিয়া, হাতের বালা ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিয়া, গরম জল, সাবান ও লাইসোল লোসন দিয়া হাত পরিষ্কার করিয়া নিবে। প্রসববেদনা কোমর হইতে আরম্ভ করিয়া তলপেট পর্য্যন্ত আসে। প্রথম প্রথম উহা অল্পক্ষণ স্থায়ী হইয়া বেদনা কমিয়া যায়, প্রসব যত নিকটবর্ত্তী হয়, বেদনা ততই প্রখর হয় এবং দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়, বেদনার বিরাম-সময় কমিতে থাকে।

বেদনা আরম্ভ হইলে যাহারা অনেক সন্তানের মা, এমন বুদ্ধিমতী পরিশ্রমী ২।১ জন স্ত্রীলোককে সূতিকাগৃহে রাখিবে, বেশী লোক রাখা বা গোলমাল করা ভাল নয়। গর্ভিণীকে সর্ব্বদা সাহস দিবে, কোন প্রকার ভয়ের কথা বলিবে না।

(১) বেদনার প্রথম অবস্থায় সাবান জলের ডুস্ দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে, নচেৎ সন্তানপ্রসবের সময় অনেক গর্ভিণী বাহ্য করার জন্য সন্তানের মাথায় মুখে লাগিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ডুস্ দেওয়ার ফলে অনেক সময় বেদনা বৃদ্ধি হইয়া সন্তান প্রসবের সাহায্য করে।

(২) ব্যাথার সময় পোয়াতীকে আস্তে আস্তে হাঁটিতে বলিবে এবং বেদনা কমিয়া গেলে চিৎ ভাবে শয়ন করাইবে, ব্যথা বাড়িলে আর শুইতে দিবে না, এবং যতক্ষণ জল না ভাঙ্গিবে ততক্ষণ এইরূপ করিবে। পানমুচী ভাঙ্গার পর পোয়াতীকে আর উঠিতে দিবে না, শোয়াইয়া রাখিবে এবং বেদনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুখ বুজিয়া কোঁৎ দিতে বলিবে, বেদনা বিরামের সময় কোঁৎ দিতে দিবে না, এইরূপ করিলে সহজে প্রসব হয়।

কৃত্রিম প্রসববেদনা—

অনেক সময় কৃত্রিম বেদনা দেখা যায়। বেদনা প্রকৃত প্রসববেদনা কিনা সহজে বোঝা যায়; প্রকৃত প্রসব বেদনা যেমন প্রথম আসিয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যায়, বিরামের সময় বেশী থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বিরামের সময় কমিয়া যাইয়া বেদনা বেশী সময় স্থায়ী হয় এবং জোরে আসে, তৎসঙ্গে জরায়ুর মুখ খুলিতে থাকে; কৃত্রিম প্রসব বেদনার সেইরূপ কোন নিয়ম থাকে না বেদনা হয়ত প্রথমেই বেশী সময় স্থায়ী হইল, বিরামের সময় কম হইল, প্রকৃত

প্রসববেদনা যেমন কোমরের দিক হইতে আসে, কৃত্রিম প্রসব-বেদনা প্রায়ই সেরূপ হয় না, বেদনা, সকল সময়ই অনিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে। বেদনায় জরায়ুর মুখ খুলিয়া যায় না। বাহ্য বন্ধ হইয়া পেটে বায়ু সঞ্চয়ের জন্য এই প্রকার বেদনা হইতে পারে, ডুস্ দিয়া বাহ্য করাইলে এ বেদনা কমিয়া যায়।

(৩) বেদনার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর মুখ আপনিই আস্তে আস্তে খুলিতে থাকে, অনেক অশিক্ষিতা দাই বাহাদুরী করিয়া জরায়ুর মুখ খুলিবার চেষ্টা করে, এরূপ কখনও করা বা জরায়ুর মুখ খুলিয়াছে কিনা তজ্জন্য বার বার আঙ্গুল দিয়া পরীক্ষাকরা ভাল নয়, ইহাতে গর্ভিণী আঁতুড়ে জ্বর হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। পানিমুচী না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত ধাত্রীকে জরায়ুর মুখ পরীক্ষা করিতে দিবে না।

(৪) পানিমুচী ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে জল বাহির হয় এবং প্রসব বেদনার স্বাভাবিক বেগের জন্য সন্তানের মাথা বাহির হইয়া আসে। মাথা বাহিরে আসামাত্র বোরিকতুলা বা পরিষ্কার ন্যাকড়া গরম জলে ফুটাইয়া ভাল করিয়া নিঙ্ড়াইয়া বোরিকলোসনে ভিজাইয়া, শিশুর চোখের পাতা ও কপাল মুছাইয়া দিবে। অপর ১খানা ন্যাকড়া ভিজাইয়া নাক, মুখ ও গলার ভিতর পরিষ্কার করিয়া দিবে। প্রসূতির স্রাব সন্তানের চক্ষের ভিতর গেলে চক্ষুর অসুখ হয়, এরূপে পরিষ্কার করিলে চক্ষুর অসুখ হয় না।

(৫) প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রসূতির পেট চাপিয়া

ধরিবে। যতক্ষণ না ফুল বাহির হয় ততক্ষণ এইরূপ ধরিয়া থাকিবে।

(৬) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। যদি না কাঁদে বুঝিতে হইবে শিশু হাঁপাইয়া গিয়াছে যদি নাড়ী দপ্ দপ্ করে, শিশু মুখ নাড়ে, হাত পা স্বাভাবিক শক্ত থাকে, তবে ভয়ের কোন কারণ নাই মনে করিবে। ছেলের গলার ভিতর আঙুল দিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবে এবং শিশুর মুখে জোরে ১০।১২ বার ফুঁ দিবে ইহাতে নিঃশ্বাস না পড়িলে পা ধরিয়া মাথা নীচু করিয়া কয়েক মিনিট রাখিবে, উপুড় করিয়া পীঠে কয়েকবার চাপড় দিবে, চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিলে নিঃশ্বাস ফেলিবে, এবং কাঁদিয়া উঠিবে। যদি ইহাতেও না কাঁদে তবে নাড়ী কাটিয়া একটী বড় গামলায় গরম জল ও অন্য একটীতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া, প্রথমে গরম জলে ২।১ সেকেণ্ড গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া, পরে ঠাণ্ডা জলে ঐ প্রকার ডুবাইবে, কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিয়াও যদি নিঃশ্বাস না ফেলে' তবে ছেলেকে কোলে শোওয়াইয়া কৃত্রিম শ্বাস করাইবে। এইরূপ কিছুক্ষণ করিলে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পড়িবে। (গরম জলে শিশুকে ডুবাইবার পূর্ব্বে জলের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যেন গায়ে সহ্য হয়।)

(৭) নাড়ী কাটা।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাড়ী কাটার দোষে শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, প্রসব বেদনা আরম্ভ
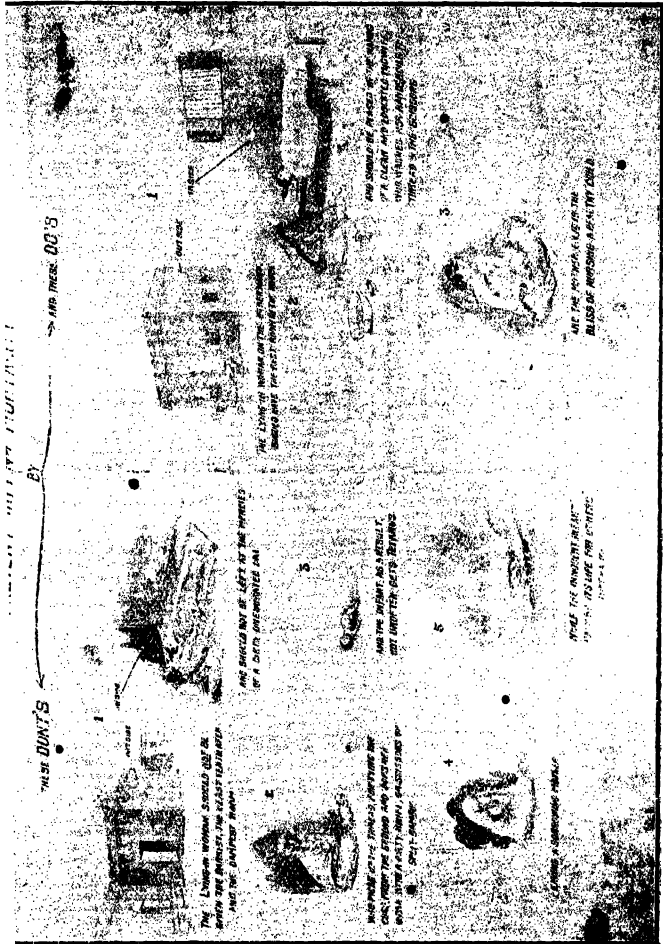
শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায়।   শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা ধাত্রীর ব্যবস্থা।

হইলে একটী হাঁড়ির ভিতর নাড়ী কাটিবার কাঁচি ও নাড়ী বাঁধিবার সূতা জলের মধ্যে রাখিয়া বেশ করিয়া ফুটাইবে। ছেলে প্রসব হইলে ধাত্রী হাত লোসনে ভাল করিয়া ধুইয়া ৫।৭ মিনিট অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিবে নাড়ীর দপ্‌দপানি কমিয়া গিয়াছে, শিশু কাঁদিয়া উঠিয়াছে তখন প্রথম দুইটী আঙুলে নাড়ী দোহন করিয়া শিশুর দিকে আস্তে আস্তে আনিবে, ইহাতে নাড়ীর রক্ত শিশুর দেহে প্রবেশ করিবে। তৎপর শিশুর নাভির ১ ইঞ্চি উপরে, ফুটন্ত জলের ভিতর যে সূতা আছে, তাহা দিয়া একটী বাঁধন দিবে ও তার ১॥ ইঞ্চি উপরে আর একটী বাঁধন দিবে।

নাড়ী বাঁধিবার সূতা বেশ টেক সই অথচ কোমল হওয়া চাই, সূতা ২ ভাজ করিয়া দিবে। নাড়ীতে গাঁট থাকে, বাঁধন-গুলি যেন গাঁটের উপর না পড়ে। গাঁটের উপর পড়িলে বাঁধ গুলি আঁটিবে না, দুই গাঁটের ভিতরে বাঁধনগুলি দিবে।

পরে ফুটন্ত জলের ভিতর যে কাঁচি আছে, তাহা দ্বারা ঐ দুই বাঁধনের মধ্যে নাড়ী কাটিয়া ফেলিবে এবং কাটা নাড়ীতে টিংচার আইওডিন্ লাগাইইবে। তারপর শিশুকে এক টুকরা গরম কাপড়ে জড়াইয়া লইবে।

ফুল পড়া—

সন্তান প্রসবের পর অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর বেদনা হইয়া জরায়ু হইতে ফুল পৃথক হইয়া বাহির হইয়া যায়। যদি রক্তস্রাব বেশী না থাকে, তবে আরো আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করা

যাইতে পারে। যদি এই সময়ের ভিতর ফুল বাহির না হয়, তবে পূর্ব্বের মতনই পেট ধরিয়া থাকিবে, যেন জরায়ু নরম না হয় এবং নাভির নীচে হাত দিয়া জোরে মালিস করিবে, মালিস করিতে করিতে একটী শক্ত বড় বলের মত অনুভব করিবে। তখন ঐ শক্ত চাকার উপর জোরে চাপ দিলে ফুল বাহির হইয়া যাইবে।

যদি উপরোক্ত প্রণালীতে ফুল বাহির না হয়, তখন ডাক্তারের বা অভিজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্যে ফুল বাহির করিবে। সাবধানতার সঙ্গে ফুল বাহির না করিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। সাবান ও গরম জল দিয়া প্রসব পথের চতুর্দ্দিক ধুইবে, পরে আবার হাত সাবান ও গরম জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া টিংচার আইওডিন হাতে মাখাইয়া জরায়ুর ভিতর প্রবেশ করাইবে। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাতের নখ ভাল করিয়া কাটিয়া নিবে।) এই সময় অপর হাত দ্বারা জরায়ু নীচের দিকে চাপিয়া রাখিবে, এবং প্রবিষ্ট হাত দিয়া ফুল ধরিয়া সাবধানে বাহির করিবে। ফুল বাহির করার পর ভাল করিয়া দেখিবে, ফুলের সকল অংশ বাহির হইল কি না। যদি কোন অংশ থাকিয়া যায়, তবে জরায়ুর ভিতর পচিয়া, দূষিত জ্বর হইয়া পোয়াতির জীবন সংশয় হয়।

ফুল বাহির হবার পর প্রসূতিকে ১ ড্রাম এক্সট্রাক্ট আর্গট লিকুইড ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিবে, ইহাতে জরায়ু সঙ্কুচিত ও রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

প্রসব দ্বার ছিঁড়িয়া যাওয়া—

সন্তান প্রসবের পর পরীক্ষা করিয়া দেখিবে প্রসব দ্বার ছিঁড়িয়া গিয়াছে কি না, যদি ছিঁড়িয়া যাইয়া থাকে, তবে লাইসোল লোসনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ঐ স্থান ঢাকিয়া রাখিবে। অন্যথা ঐ ক্ষত স্থানে বিষ প্রবেশ করিতে পারে। তৎপর যতশীঘ্র সম্ভব ডাক্তার ডাকাইয়া শেলাই করিবে।

প্রসূতির পেটে পেটী বাঁধা—

প্রসবের পর প্রসূতির পেটে পেটী বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অধুনা কেহ কেহ ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, কিন্তু পেট বাঁধিয়া দিলে অনেক স্থলে পেট ঝুলিয়া পড়ে না এবং প্রসূতি অনেকটা আরাম বোধ করিয়া থাকেন। পাশ ফিরিবার সময় জরায়ু নড়ে না, পেট বান্ধা না হইলে প্রসূতিকে অনেকদিন চিৎ হইয়া একই ভাবে শুইয়া থাকিতে হয়।

প্রসূতিকে দুই পা একত্র করিয়া বেশ সোজাভাবে শোয়াইবে, তারপর, ২ ভাঁজ করা ১ হাত চওড়া, ৩ হাত লম্বা একখানা শক্ত কাপড় পিঠের নীচদিয়া নিয়া, বুকের কুড়া হইতে উরতের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রাখিয়া, ভাঁজের স্থানের উভয় প্রান্ত ১ হাত পরিমাণ ছিঁড়িবে। তৎপর উভয় দিকের ভিতরের অংশ দ্বারা পেট ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিবে, এবং উপরের কাপড়ের উভয় প্রান্ত ৩।৪টি সরু অংশে বিভক্ত করিয়া ছিড়িবে। উপর হইতে পেটের নীচের দিকে,

উভয় প্রান্তের সরু অংশগুলি বেশ টাইট করিয়া বাঁধিয়া দিবে। উপরের ২টী বাঁধন একটু ঢিলা করিয়া দিবে। তা না হইলে খাবার পর কষ্ট হয়। এই ভাবে এক সপ্তাহ পেটী বাঁধিয়া রাখিবে, ভিজিয়া গেলে, পেটী বদ্‌লাইয়া অন্য পেটী দিবে।

এই সময় প্রসূতির স্রাব হইয়া থাকে। কোমরে একটা দড়ি বাঁধিয়া ঋতুকালীন যেরূপ ন্যাকড়া ব্যবহার করে তদ্রূপ করিবে। যে ন্যাকড়া পূর্ব্বে ধোয়াইয়া কাগজের বাক্সে রাখা হইয়াছিল, তাহাই ব্যবহার করিবে। ন্যাকড়াগুলি ব্যবহারের পূর্ব্বে আগুনে সেকিয়া নেওয়া ভাল।

গরম সেক দেওয়া—

অনেকে প্রসূতিকে গরম সেক দিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক মেম ডাক্তার আগুনের সেক দিতে নিষেধ করেন। ইহার অপকারিতা কি জানি না বরং আগুনের সেক দিলে, পেটের বেদনা কমিয়া যায়, প্রসূতি আরাম বোধ করিয়া থাকেন। আগুনের গামলায় জলন্ত কয়লা বা গুল রাখিয়া, নেকড়ার পোট্‌লা গরম করিয়া পেটে সেক দিবে, পা কন্‌ কন্‌ করিলে পায়ে সেক দেওয়া ভাল। ঘরে যাহাতে ধূঁয়া না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

শিশুর স্নান

আমাদের গৃহের নূতন অতিথিটীকে সেই হইতে, একটুকরা গরম কাপড়ে জড়াইয়া রাখিয়াছি। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে

মাতৃগর্ভে জরায়ুর ভিতর গরমে ছিল, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে, শিশুর সর্দ্দি, কাশী, নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইতে পারে, অতএব অতিশয় সাবধানে রাখিতে এবং স্নান করাইতে

মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুদের গায়ে পুরু ছ্যাৎলা পরে, মাথায় ময়লা জমাট থাকে। প্রথম সুইট অয়েল বা নারিকেল তেল গরম করিয়া তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া শরীরের ময়লা ভালরূপে তুলিয়া দিবে, পরে ন্যাকড়ায় সাবান মাখাইয়া মাথার ময়লা ও শরীর বেশ পরিষ্কার করিয়া, একটা বড় গামলায় গরম জল নিয়া স্নান করাইবে। স্নানের পর শুষ্ক নরম কাপড় দিয়া গা মুছিয়া, পাউডার মাখাইবে। তারপর একখানা ৬ ইঞ্চি পরিমাণ পরিষ্কার ন্যাকড়া (যাহা জলে সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বেই শুকাইয়া রাখা হইয়াছে) দুই ভাঁজ করিয়া, তাহার মধ্যে একটী ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া কাটা নাড়ী গলাইয়া দিবে। এই সময় ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবে যে কাটা নাড়ী হইতে রক্ত বাহির হইতেছে কিনা, যদি রক্তস্রাব হয়, তবে আর একটা বাঁধন দেওয়া প্রয়োজন। নাভির কাটা স্থানে টিংচার আইওডিন লাগাইয়া, জিঙ্কবোরিক পাউডার (zinc Boric powder) নাড়ীতে ছড়াইয়া দিয়া বোরিক তুলা, গজ বা পরিষ্কার ন্যাকড়া ৪।৫ ভাঁজ করিয়া, নাভি ঢাকিয়া তার উপরে পেটী বাঁধিয়া দিবে। ১০।১২ আঙ্গুল প্রস্থ ও ১ হাত লম্বা পরিষ্কার শক্ত ন্যাকড়া, দুই ভাঁজ

করিয়া মায়ের পেট বাঁধার মত শিশুর পেট বাঁধিয়া দিবে।

শিশু প্রস্রাব করিয়া অনেক সময় পেটি ভিজাইয়া ফেলে, ভিজিয়া গেলে তখনই বদলাইয়া দিবে।•

শিশুর সমস্ত শরীর বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি কোন প্রকার অঙ্গহানি থাকে, তবে তখনই ডাক্তার ডাকিবে।

ধনুষ্টঙ্কার বা পেঁচোয় পাওয়া।

আমাদের দেশে মৃত শিশুদের ভিতর শতকরা ১১জন সূতিকা ঘরে মারা যায়। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ ধনুষ্টঙ্কার। নাড়ী কাটার দোষে, ও নাড়ী কাটার সময় অপরিষ্কার অস্ত্র, অপরিষ্কার বিছানা ব্যবহার করা এবং শিশুর কাটা নাড়ী অনাবৃত রাখার জন্য রক্তের ভিতর উক্ত ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করিয়া ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধির সৃষ্টি করে। এই ব্যাধির বীজ ধূলা ময়লার ভিতর লুক্কায়িত থাকে। ইহার লক্ষণ—শিশুর চোয়াল বন্ধ হইয়া শরীর শক্ত হইয়া যায়, চীৎকার করিয়া ধনুকের মত শরীর বাঁকিয়া যায়, বুক উঁচু হইয়া উঠে, শরীরের রং একেবার লাল হয়, আবার সবুজ হইয়া যায়, দুধ টানিয়া খাইতে পারে না। অনেক অশিক্ষিত লোকে ইহাকে পেঁচোয় পাওয়া, ভূতের দৃষ্টি, মূর্ত্তি ধরা বা বাতাস লাগা বলে। ইহার ফলে তাহারা চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ওঝাকে ডাকে, ওঝারা জল পড়া

পেঁচোয় পাওয়া ভুতের দৃষ্টি নহে, ইহা রোগের বিষ। ময়লা কাপড়ে, কাঁচি, সুতায় থাকে, জলে ফুটাইলে বিষ নষ্ট হয়।

দেয়, মন্ত্র পড়ে; কখনও বা ভূত ছাড়াইবার জন্য সূতিকা ঘরের দরজাজানালা বন্ধ করিয়া প্রজ্জ্বলিত আগুনের ভিতর সরিষা ও লঙ্কা মন্ত্রপূত করিয়া পোড়াইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস ঐ সকল উগ্র গন্ধে ভূত পালাইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় অনেক স্থলে ভূত ছাড়িবার স্থলে শিশুই ইহলোক ছাড়িয়া যায় (আমার চিকিৎসক জীবনে এইরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছি।) এই প্রকার হইলে তখনই চিকিৎসক ডাকিবে এবং শিশুকে তখনই মায়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবে, অন্যথা শিশুর শরীরের বিষ মায়ের দেহে প্রবেশ করিবে। চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে শিশুর মুখ ফাঁক করিয়া আস্তে আস্তে ২।৪ ফোটা দুধ খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে। সুচিকিৎসা এবং উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা হইলে এই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসূতি কল্যাণ

আঁতুড়ে প্রসূতির পরিচর্য্যা

প্রসবের পরই মাতা ও শিশু নিরাপদ হইল এরূপ মনে করিবে না। প্রসবের পর আঁতুড় ঘরে অনেক মা সূতিকার ব্যারামে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান, বিলাতের তুলনায়

আমাদের দেশে সূতিকা রোগে ৫০ গুণ অধিক প্রসূতি মারা যায়। বাংলা দেশে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ৩০,০০০ প্রসূতির মৃত্যু হয়। অতএব প্রসবের পর প্রসূতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্রাম—

প্রসবের পর মায়ের পেটী-বাঁধা হয়ে গেলে আঁতুড় ঘর ভালরূপে পরিস্কার করিবে। প্রসূতিকে চিৎ করিয়া শোয়ইয়া-রাখিবে, তিন দিন পর্য্যন্ত উঠিতে দিবে না, সর্ব্বদা শোয়াইয়া রাখা ভাল, চতুর্থ দিন হইতে বিছানায় উঠিয়া বসিতে দিবে, ১০ দিন পর বিছানা হইতে নামিতে পারে, কিন্তু বেশী হাঁটা চলা উচিত নয়, বেশী হাঁটা চলার ফলে অধিক রক্তস্রাব হইতে পারে।

প্রসবের পরই ক্লান্তি-বশতঃ অনেক প্রসূতি ঘুমাইয়া পড়ে, যাহাতে প্রসূতি বেশ নিদ্রা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ঘরে বেশী লোক থাকিয়া প্রসূতির নিদ্রার যাহাতে ব্যাঘাত না করে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিবে। যদি দেখ প্রসূতি নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না, অস্বস্তি বোধ করিতেছে, এ পাশ ও পাশ করিয়া কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, ইহাকে মন্দ লক্ষণ জানিয়া তখনই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য—

প্রসবের পর প্রথম তিন দিন সাগু বা বার্লী দুধের সঙ্গে দিবে, হজম করিতে পারিলে অন্ততঃ একসের পরিমাণ দুধ,

বার্লি বা সাগুর সঙ্গে দেওয়াই ভাল। প্রসূতি ভাল থাকিলে চতুর্থ দিন হইতে এক বেলা পুরাতন সরু চাউলের ভাত, মাছের ঝোল এবং রাত্রে পাঁউরুটী, দুধ, লুচি যাহা সহ্য হয় সেই অনুসারে খাওয়াইবে। ইহা ব্যতীত দিনের ভিতর ৩।৪ বার দুধ সাগু দিলে মায়ের স্তনে দুধ হইবার সাহায্য করে। এ সময় প্রসূতিদের খুব ক্ষুধা হয়, ক্ষুধা হইলেই খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পানীয় জল—

প্রসবের সময় শরীর হইতে অনেক রক্ত ও জল বাহির হইয়া যায়, এই অভাব পূরণের জন্য প্রসূতির খুব পিপাসা হয়, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ কোন কোন দেশে প্রসূতিকে জল দেওয়া হয় না, তাহাদের ধারণা জল পান করিলে কাঁচা নাড়ী পাকিয়া জ্বর হইবে, এরূপ ধারণা অত্যন্ত ভুল। জল পান করিলে নাড়ীর কোনই দোষ হয় না বরং জল না দিলে প্রসূতির ভয়ানক অনিষ্ট হয়।

(১) জলের অভাবে দেহের ক্ষতি পূরণ হয় না।

(২) জল পান করিলে প্রসূতির যথেষ্ট প্রস্রাব হয়, এবং সেই সঙ্গে দেহস্থিত বিষ প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। অতএব, প্রসূতিকে যথেষ্ট জল খাইতে দিবে। পিপাসা না পাইলেও জল খাওয়ান ভাল। প্রত্যহ ১৷৷০ হইতে ২ সের জলীয় পথ্য দেওয়া উচিত। প্রসূতিকে যে পানীয় জল দিবে, তাহা অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ফুটাইয়া, ঠাণ্ডা করিয়া লইবে।

লোসিয়া স্রাব—

প্রসবের পর জরায়ু হইতে যে স্রাব হয় তাহাকে লোসিয়া স্রাব কহে। প্রথম তিন দিন এই স্রাব খুব লাল রক্তের মত হয়, পরে আস্তে আস্তে লাল রঙ কমিয়া যাইয়া সাদা হইতে থাকে, দ্বিতীয় সপ্তাহের ভিতর একেবারে সাদা হইয়া যায়, এক মাসের ভিতর স্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া থাকে।

সকল প্রসূতির সমান স্রাব হয় না। রক্তহীন প্রসূতির স্রাব কম হয়, এই স্রাবে কোন প্রকার গন্ধ থাকে না। যদি স্রাব ভালরূপে না হয়, জরায়ুর ভিতর চাপ চাপ রক্ত থাকে অথবা ফুলের কোন অংশ জরায়ুর ভিতর থাকিয়া যায়, তবে স্রাবে দুর্গন্ধ হয়, সেই সঙ্গে জ্বর হয়। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া ডুস দ্বারা জরায়ু ধোয়াইয়া দিবে। প্রসূতির খাট মাথার দিকে উঁচু করিয়া দিবে, তা হইলে স্রাব আপনি বাহির হইয়া যাইবে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব—

প্রসবের পর নানা কারণে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইতে পারে, বেশী রক্তস্রাবের জন্য প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হাত, পা ঠাণ্ডা হইয়া যায় এমন কি হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া প্রসূতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রক্তস্রাব হইয়া যদি নেংটি ভিজিয়া বিছানা ভিজিয়া যায়, তবেই স্রাব অতিরিক্ত বুঝিয়া, তখনই ডাক্তার ডাকিবে।

ভেদাল ব্যথা—

প্রসবের পর জরায়ু যখন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তখন ২।৩ দিন পর্য্যন্ত প্রসব বেদনার মত প্রসূতির অল্প অল্প বেদনা হয়, এই বেদনায় জরায়ুর মধ্যস্থিত রক্তের চাপ, মেম্ব্রেনের (membrane) টুকরা ফুলের কুচি সব বাহির হইয়া যায়। জরায়ু আস্তে আস্তে রগড়াইয়া দিলে রক্তের চাপ ইত্যাদি শীঘ্র বাহির হইয়া বেদনা উপশম হয়। এই বেদনার জন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা—

প্রসবের পর জরায়ু সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ দিনে অনেক ছোট হইয়া যায়, জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে দেড় মাস লাগে। এই সময় পর্য্যন্ত বেশী হাঁটা চলা, পরিশ্রম প্রভৃতি করিলে জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হইয়া পেটে ও কোমরে ব্যথা হয়, এবং রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতএব দেড় মাস পর্য্যন্ত প্রসূতির বিশ্রাম প্রয়োজন।

স্নান—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দশ দিনের পূর্ব্বে, প্রসূতিকে বিছানা হইতে উঠিতে দিবে না। এই ১০ দিন গরম জল দিয়া প্রত্যহ প্রসূতির গা মুছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তার পর ১ মাস পর্য্যন্ত গরম জলে স্নান করিতে দিবে।

"পাঁচ উঠানি"—অনেক দেশে প্রসূতিকে পাঁচ দিন, উঠানে যে অস্থায়ী আঁতুড় ঘর করে তাহাতে থাকিতে হয়,

পাঁচরাত্রের পর প্রসূতিকে পুকুরে ডুব দিয়া স্নান করাইয়া ঘরে নেয়। ইহাকে "পাঁচ উঠানি" বলে। (পাঁচ দিন উঠানে অর্থাৎ আঙ্গিনায় থাকিতে হয় এবং তারপর স্নান করাইয়া ঘরে উঠান (নেওয়া) হয় বলিয়া ইহাকে পাঁচ উঠানি বলে)। পাঁচ দিনের দিন দুর্ব্বল শরীরে পুকুরে হাঁটিয়া যাইয়া স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ঘরে ফিরিতে হয়, এই গ্রাম্যপ্রথা অতিশয় দূষণীয়, ইহাতে প্রসূতি অধিকাংশ সময়ে কঠিন জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। গ্রামের এই প্রথার জন্য অনেক প্রসূতিকে সূতিকাজ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, পাঁচ দিনে পুকুরে স্নান করাইবার প্রথা ভয়ানক মারাত্মক।

মাসিক আঁতুর ঘর—

"পাঁচ উঠানির" পর প্রসূতিকে বাহিরের আঁতুড় ঘর ছাড়িয়া ঘরের আঁতুড় ঘরে এক মাস কাল থাকিতে হয়। বাড়ীর ভিতর একটী অপ্রশস্ত ছোট ঘরে মা ও ছেলেকে থাকিতে হয়, ঘরের জানালা ইত্যাদি না থাকার জন্য বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে প্রায়ই স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। মানুষের সর্ব্বদা যথেষ্ট আলো ও বাতাসের প্রয়োজন, অতএব মাসিক ঘর ও এমন হওয়া উচিত যাহাতে ঘরে যথেষ্ট দরজা ও জানালা থাকে, রৌদ্র ও বাতাসের অভাব না হয়। সূর্য্য রশ্মির রোগজীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে; শিশুর শরীরে ও আঁতুড়ের বিছানায় রৌদ্র লাগিলে প্রভূত উপকার হয়।

"বাতাস লাগা"—গ্রামে অশিক্ষিতা নারীরা "বাতাস

লাগা”র ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির, তাঁহারা মনে করেন ঘরের দরজা জানলা খোলা থাকিলে বাতাস লাগিবে অর্থাৎ শিশু ও মায়ের উপর ঐ সব খোলা জানালার ভিতর দিয়া ভূতের দৃষ্টি পড়িবে ; এই ভয় শনি ও মঙ্গল বারেই বেশী। এই অজ্ঞতার জন্য সর্ব্বদাই সব দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বন্ধ হাওয়ার ভিতরে শিশু ও মাকে থাকিতে বাধ্য করে। দুর্ব্বল মা ও শিশুর জন্য সর্ব্বদাই যথেষ্ট বিশুদ্ধ হাওয়ার প্রয়োজন অতএব দিনে রাত্রে জানালা খুলিয়া শুইবে, গায়ে ঠাণ্ডা না লাগে তজ্জন্য গা ঢাকিয়া রাখিবে, যখন যেরূপ জামা ব্যবহার প্রয়োজন, সেইরূপ জামা পরিধান করিবে।

আঁতুড় ঘরে প্রদীপ রাখা—

অনেক দেশে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আঁতুড় ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবার নিয়ম আছে। বন্ধ ঘরে জ্বলন্ত প্রদীপ বা আগুন রাখার জন্য, ঘরের বায়ু দূষিত হয়, এবং বাধ্য হইয়া সেই দূষিত বায়ু গ্রহণ করিতে হয়। জানালা খুলিয়া রাখিলে ঘরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং বিশুদ্ধ বাতাস গৃহে প্রবেশ করিবার সুবিধা হয়।

মল মূত্র—

প্রসবের পর অনেক প্রসূতি ২।১ দিন মলত্যাগ করে না, ২।৩ দিনের ভিতর মলত্যাগ না করিলে জোলাপ দিয়া অথবা সাবানজল দিয়া, ডুস দিয়া, পেট পরিষ্কার করিয়া দিবে।

পেটের ভিতর মল সঞ্চিত থাকিলে রক্ত বিষাক্ত হইয়া কঠিন রোগ হয়।

প্রসবের পর ১০।১২ ঘণ্টার ভিতর প্রস্রাব না হইলে, চিৎ হইয়া প্রস্রাব না হইলে উপুড় হইয়া প্রস্রাব করিতে বলিবে, ইহাতেও প্রস্রাব না হইলে কিড্‌ণীতে (kidney) গরম সেক দিবে, এবং আবশ্যক হইলে ডাক্তার ডাকিয়া শলাপাশ (কেথিটার) দ্বারা প্রস্রাব করাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যথেষ্ট মল মূত্র ত্যাগ না করিলে শরীর হইতে বিষ বাহির না হওয়ার জন্য সমস্ত রক্ত বিষাক্ত হইয়া দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া থাকে।

প্রত্যেকবার মল মূত্র ত্যাগের পর লাইসোল লোসনে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া প্রসব দ্বার পরিষ্কার করিয়া বোরাসিক তুলা দিয়া প্রসব দ্বার ঢাকিয়া, নূতন নেংটী পরাইয়া দিবে। আঁতুড় ঘর হইতে মলমূত্র ও অপরিষ্কার ন্যাকড়া তখনই বাহির করিয়া ফেলিবে।

স্তন পাকা—

প্রসবের পর প্রথম দুইদিন দুধ হয় না, স্তন টিপিলে একটু একটু হল্‌দে রসের মত বাহির হয়, এই সময় হইতেই শিশুকে মাই ধরাইবে। শিশুকে স্তন দিবার পূর্ব্বে এবং পরে প্রত্যেক-বার স্তন গরম জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। প্রত্যেক বার স্তন দিবার পূর্ব্বে স্তন টিপিয়া একটু দুধ বাহির করিয়া ফেলিয়া শিশুর মুখে স্তন দিবে।

কোন কোন মায়ের অতিরিক্ত দুধ হইবার জন্য, কখনও বা স্তনের বোটার ছিদ্র বন্ধ হইয়া, কোথাও স্তনের ছিদ্র পথের ভিতরে কীটানু প্রবেশ করিয়া, স্তন ফুলিয়া শক্ত হইয়া বেদনা হয়, ও লাল হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও হয়। এই রকম হইলে গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া স্তনে ভালরূপে সেঁক দিয়া দুধ গালিয়া ফেলিবে। বড় মুখের শিশির ভিতর খুব গরম জল পুরিয়া, জল ঢালিয়া ফেলিয়া, তখনই সেই শিশির মুখ স্তনের বোটার উপর চাপিয়া ধরিলে দুধ বাহির হইয়া আসে, অনেক স্থলে এই সব উপায়ে দুধ বাহির হইয়া বেদনা কমিয়া যায়, স্তনের ফুলা কমিয়া নরম হয়। যদি ইহাতে কমিয়া না গিয়া বেদনা বৃদ্ধি হয় ও স্তন পাকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

সূতিকা জ্বর—

আঁতুড় ঘরে প্রসূতির যে জ্বর হয়, তাহাকেই সূতিকা জ্বর বলে, প্রসবের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে অনেকসময় সামান্য জ্বর হইয়া কমিয়া যায়, তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু যে প্রসূতির জ্বর খুব প্রবল হয়; তৎসঙ্গে পেটে বেদনা, দুর্গন্ধ স্রাব, তলপেট শক্ত, জিহ্বা অপরিষ্কার, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, পিপাসা, মাথায় যন্ত্রণা, প্রস্রাব রক্তবর্ণ ও চক্ষু অল্প লাল, প্রলাপ বকা, হাত পায়ের গাঁট ফোলা ও বেদনা, অনিদ্রা মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া যাওয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখনই

বুঝিতে হইবে, জরায়ু দূষিত হইয়া রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে। আঁতুড় ঘরের দোষ, ধাত্রীর অপরিষ্কার হাত, প্রসূতির গর্ভাবস্থায় দূষিত স্রাব, প্রসবের সময় প্রসব পথ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় বা জরায়ুর ভিতর কোন স্থান ফাটিয়া যাওয়ায়, জরায়ুর ভিতর ফুলের কোন অংশ লাগিয়া থাকার জন্য এবং প্রসব পথে নানা প্রকার ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করিয়া ঐ সব ক্ষত স্থানে যাইয়া এই বিষাক্ত জ্বরের সৃষ্টি করে। অনেক প্রসূতি এই ব্যাধিতেই মারা যায়, পূর্ব্ব অধ্যায়ে আঁতুড় ঘরে ধাত্রী, নাড়ীকাটা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য যে সব সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পালন করিলে সূতিকাজ্বর হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই সব সাবধানতা নেওয়া হয় বলিয়া হাঁসপাতালে প্রসবের পর প্রায়ই সূতিকাজ্বর হইতে দেখা যায় না।

সূতিকা জ্বর হইলেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। চিকিৎসক আনিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া রোগিণীর কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

(১) সর্ব্বদা বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে।

(২) জ্বর ১০২।১০৩ ডিগ্রী হইলে মাথা ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া কপালে জলপটী ও মাথায় বরফ দিবে।

(৩) মল ও মূত্র বন্ধ থাকিলে ডুস দিয়া পেট পরিষ্কার করিয়া দিবে, মলত্যাগকালে আপনিই প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

(৪) যথেষ্ট জলপান করাইবে।

(৫) তলপেটে বেদনা থাকিলে, তিসির বা ভুষির পুলটিস ও গরম সেক দিবে।

(৬) দুর্গন্ধ স্রাব থাকিলে লাইসোল লোসনের ডুস দিয়া জরায়ু ধৌত করিয়া দিবে।

(৭) প্রসূতি যাহাতে ঘুমাইতে পারে, নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাই করিবে।

(৮) দুধ, সাগু বা বার্লি খাওয়াইবে।

পা ফোলা—

প্রসবের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোন কোন প্রসূতির পা ও কুচ্‌কি ফুলিয়া বেদনা হয়, এরূপ হইলে বিছানা হইতে উঠিতে দিবে না, গরম সেক দিবে, পুষ্টিকর খাদ্য দিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

শিশু মঙ্গল।

শিশুরাই পরিবারের ভবিষ্যৎ, ইহারাই পরিবার দেহের ভাবী মেরুদণ্ড, মেরুদণ্ড শক্ত ও সবল না হইলে মানুষ যেমন কোন কার্য্যেরই উপযোগী হয় না, তদ্রূপ শিশুর শরীর মন সুগঠিত না হইলে সে কর্ম্মজীবনে পরিবারের ভার বহন করিতে পারে না। এই শিশুর শরীর ও মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, মাতা ও পরিবারস্থ লোকের উপর। বাল্যে পরিবারস্থ

লোকের উপর তাহাকে সকল বিষয়েই নির্ভর করিতে হয় ; অতএব তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা শিশুর উপর রাখিতে হইবে।

আঁতুড়ে শিশুর পরিচর্য্যা।

দুগ্ধ খাওয়ান—

ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্নানান্তে শিশুর নাড়ী বাঁধা হইলে, মায়ের স্তন গরম জলে ভালরূপ পরিষ্কার করিয়া শিশুকে মাই খাওয়াইবে। দুই দিন পর্য্যন্ত মায়ের স্তনে দুগ্ধ হয় না, স্তনের বোটায় চাপ দিলে হরিদ্রা বর্ণের রসের মত বাহির হয়, ইহা খাইলে শিশুর বাহ্য হইয়া পেট পরিস্কার হয়। প্রথম দিন এইরূপ চারিবার, দ্বিতীয় দিনে ছয় বার স্তন দিবে, তৃতীয় দিন হইতে দিনে ৮।১০ বার এবং রাত্রে দশটা হইতে প্রাতে ছয়টার ভিতরে একবার দুগ্ধ দিবে। প্রত্যেক স্তন ৫ মিনিট খাইতে দিবে। অনেক দেশে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর মুখে মধু দিবার রীতি আছে, কিন্তু মধু টাট্‌কা হওয়া প্রয়োজন, মধু বেশী দিলে পেট গরম হইয়া পেট ফাঁপিয়া থাকে, অতএব কখনও বেশী মধু খাওয়ান উচিৎ নয়।

মায়ের স্তনে যদি দুগ্ধ না আসে, তবে গরম জলের সঙ্গে দুগ্ধশর্করা মিশাইয়া অথবা গরম জলের সঙ্গে মিছরী ফুটাইয়া শিশুকে তাহাই দিবে। প্রত্যেক বার এক ড্রাম (৬০ ফোটা) পরিমাণ খাওয়াইবে। তৃতীয় দিবস হইতে যদি স্তনে শিশুর

উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহা হইলে মিছরীর জল দেওয়ার প্রয়োজন নাই। শিশুর কোষ্ঠ পরিস্কার ও প্রস্রাব না হইলে ফুটান মিছরীর জল দিনের ভিতর ২।১ বার দেওয়া ভাল। ইহাতে অনেক সময় বাহ্যে প্রস্রাব হয়।

অনেক মা শিশু কাঁদিলেই ক্ষুধা পাইয়াছে মনে করিয়া দুগ্ধ দিয়া থাকেন ইহা ভাল নয়। অতিরিক্ত খাইবার জন্য শিশুর অজীর্ণ রোগ হয়। পিপাসা পাওয়া, পেট কামড়ান, শুইবার অসুবিধার জন্যও কাঁদিয়া থাকে। যে কোন কারণেই শিশু কাঁদুক না কেন, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত খাওয়ান উচিৎ নয়, কয়েক দিন অভ্যাস করিলেই শিশু নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া খাইতে চাহিবে না। প্রথম দিবস ৬য় ঘণ্টা অন্তর, দ্বিতীয় দিবস ৪ ঘণ্টা ও তৃতীয় দিবস হইতে ১ মাস পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রে (১০টা—৬টা) একবার দুগ্ধ দিবে। ইহার মধ্যে কাঁদিলে গরম জলে মিছরী ফুটান ২।১ চামচ দিতে পারা যায়। তৃতীয় দিন হইতে মায়ের দুগ্ধ না হইলে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী শিশুকে গরুর দুগ্ধ জলের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। গরুর দুগ্ধের সঙ্গে জল মিশাইলে স্তন্য দুগ্ধে যে পরিমাণ চিনি ও মাখনের অংশ থাকে তাহা কমিয়া যায়। তজ্জন্য শিশুর জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী মত গরুর দুগ্ধের সঙ্গে ক্রিম, দুগ্ধ শর্করা বা চিনি, মিছরী মিশাইয়া নিবে।

মাতৃ দুগ্ধের অভাব হইলে ১ম ও ২য় দিনে ৪ আউন্স

(২ ছটাক) গরম জলের সহিত ৪ ড্রাম দুগ্ধ শর্করা, মিছরী বা চিনি মিশাইয়া প্রথম দিন ৬ ঘণ্টান্তর ও ২দিন ৪ ঘণ্টান্তর দিবে।

৩য় দিন হইতে ১৪দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেকবার ১½ হইতে ২আউন্স পরিমাণ জল মিশ্রিত দুগ্ধ ৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। ২৪ ঘণ্টায় ১৬ হইতে ২০ আউন্স দিবে।

১৫ হইতে ৩০ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেকবার ২ আউন্স ৪ ড্রাম পরিমাণ জল মিশ্রিত দুগ্ধ ৩ ঘণ্টান্তর, সমস্ত দিনে মোট ২০ আউন্স হইতে ২৪আউন্স দিবে। শিশুর শারীরিক অবস্থাও হজম করিবার শক্তির উপর খাওয়ার পরিমাণ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিবে।

প্রথম সপ্তাহে দুগ্ধ ১ ভাগ জল ৩ ভাগ এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে দুধ ১ ভাগ ও জল ২ ভাগ মিশাইতে হইবে। প্রত্যেক-বারে জল মিশ্রিত দুগ্ধের সঙ্গে ২ হইতে ৪ ড্রাম চিনি বা মিছরী মিশাইয়া লইবে।

গরুর দুগ্ধে জল মিশাইলে মাখনের অংশ কমিয়া যায়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই অভাব পূরণ করিবার জন্য ২৪ ঘণ্টার জন্য যে দুগ্ধ প্রস্তুত করিবে তাহার সঙ্গে ১½ আউন্স ক্রিম মিশ্রিত করিয়া নিলে ভাল হয়—(ক্রিমের অভাবে কেহ কেহ সামান্য দুগ্ধের সর মিশ্রিত করিয়া নেয়)

ক্রিম প্রস্তুত প্রণালী ঃ—একটা সরু বোতল বা মেজর (Measure) গ্লাসে ৩ ঘণ্টাকাল দুগ্ধ রাখিয়া দিলে

ক্রিম উপরে ভাসিয়া উঠে তখন নিচের দুগ্ধ পাতলা এবং উপরের দুগ্ধ ঘন হয়, এই উপরের অংশ ক্রিম। ছাগলের দুগ্ধে ক্রিম মিশ্রিত করিবার আবশ্যক হয় না। তবে ছাগলের দুগ্ধে, ৩ দিন হইতে ১ মাস পর্য্যন্ত ৩ গুণ জল মিশাইতে হয়।

শিশুর স্নান—

শিশুকে প্রত্যেক দিন গরম জলে স্নান করাইবে। স্নানের পূর্ব্বে ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া লইবে যেন শিশুর শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগে। স্নানের পূর্ব্বে শিশুর জামা নেংটি তোয়ালে প্রভৃতি, ও যতদিন নাড়ী পড়িয়া না যায় ততদিন নাভি বাঁধিবার কাপড়, পাউডার, বোরাসিক কটন প্রভৃতি সামনে রাখিবে। নাভি শুকাইয়া না পড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত শিশুকে জলে ডুবাইয়া স্নান করাইবে না, গরম জল দিয়া শরীর ভাল করিয়া মুছাইয়া দিবে। গামলার জল হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে গরম শিশুর শরীরে সহ্য হইবে কি না। সর্ব্বপ্রথম ঠাণ্ডাজল দিয়া মাথা ধুইয়া নিবে, তারপর গরম জল দিয়া শিশুকে স্নান করাইবে, স্নান করাইবার সময় দেখিবে গলায়, কুচকি, কানের পিছনে কোথাও ময়লা জমিয়া আছে কি না। সাবধানতার সহিত এই সব স্থানের ও মাথার ময়লা তুলিয়া ফেলিবে, নচেৎ ময়লা জমিয়া শিশুর শরীরে ঘা হইয়া থাকে। স্নানের পর নরম তোয়ালে দিয়া গা মুছাইয়া শিশুকে জামা পরাইয়া দিবে, নাভি বাঁধিবার

কাপড় ভিজিয়া গিয়া থাকিলে পরিষ্কার কাপড় দিয়া পূর্ব্ববৎ নেংটী বাঁধিয়া দিবে। নাভি পড়িয়া যাইবার পরও এক মাস নাভিতে পেটী বাঁধিবে।

শিশুর জিহ্বা ঃ--

প্রত্যেকবার দুধ খাইবার পর শিশুর মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে এবং প্রত্যেক দিন প্রাতে পরিষ্কার একখণ্ড নরম ন্যাকড়া গরম জলে ধুইয়া আঙ্গুলে জড়াইয়া একটু খয়ের মাখাইয়া, জিহ্বার উপরের সাদা ময়লা পরিষ্কার করিয়া আবার ফুটান জলে ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে। প্রত্যেক দিন জিহ্বা এইরূপ পরিষ্কার না করিলে মুখে ঘা হয়।

শিশুর চক্ষের উপর প্রত্যেক দিন বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। বাঙ্গলা দেশে ৩৪ হাজার অন্ধ, ইহার ভিতর অধিকাংশ জন্মান্ধ বলিয়া লোকের ধারণা, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গর্ভ হইতে অন্ধ হইয়া প্রায় কেহ জন্ম গ্রহণ করে না; অধিকাংশই সূতিকা ঘরে অন্ধ হয়। আমার চিকিৎসক জীবনের সময়ের একটী শিশুর বিষয় বেশ মনে আছে, জন্মিবার ৩।৪ দিন পরে শিশুটীর চক্ষু লাল হইয়া, চক্ষে জল ও পিচুটী পড়িত, শিশুটীর বয়স যখন ১০ দিন তখন চিকিৎসার্থ আহুত হইয়া দেখিলাম তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম প্রসূতির শ্বেতপ্রদর রোগই শিশুর অন্ধ হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

(১) মায়ের শ্বেত প্রদর (২) পিতামাতার সিফিলিস (গরমী) (৩) সূতিকা ঘরের ধূয়া (৪) ঠাণ্ডা লাগা (৫) প্রসবের সময়ের স্রাব চক্ষুতে লাগা প্রভৃতি কারণে শিশুদের আঁতুড় ঘরে চক্ষুর অসুখ হয়।

কোন স্ত্রীলোকের প্রদরের বা পিতামাতার গরমীর ব্যারাম থাকিলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। গর্ভিণীর প্রদরের ব্যারাম থাকুক বা নাই থাকুক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শিশুর মুখ বাহির হইলেই সর্ব্বপ্রথমে বোরাসিক লোসনে পরিষ্কার ন্যাকড়া বা বোরিক তুলা ভিজাইয়া চক্ষু ভাল করিয়া মুছাইয়া দিবে এবং প্রত্যেকদিন এইরূপে মুছাইবে। চক্ষু মুছাইবার ন্যাকড়া সাবধানে পোড়াইয়া ফেলিবে এবং ন্যাকড়া একবারের বেশী ব্যবহার করিবে না। এক চক্ষুর অসুখ হইলে সেই চক্ষুর পিচুটী অথবা সেই চক্ষের ব্যবহার্য্য ন্যাকড়া যেন অপর চক্ষে না লাগে সে বিষয় সাবধান হইবে। (২০ গ্রেন বোরাসিক এসিড ২ আউন্স গরম জল মিশাইয়া লোসন করিবে) প্রসূতির প্রদরের ব্যারাম থাকিলে শিশুর চক্ষে কষ্টিক লোসন দিবে। (১আউন্স গোলাপ জলে দুই গ্রেন সিলভার নাইট্রেট দিয়া লোসন তৈয়ার করিবে।)

ঘরের ভিতর ধূয়া ও শিশুর শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে তদ্রুপ ব্যবস্থা করিবে। চক্ষে কাজল পড়ান মন্দ নয়, শিশুর চক্ষু দিয়া জল পড়িলে কিম্বা লাল হইলে তখনই ডাক্তার ডাকিবে।

শিশুর মল—

ভূমিষ্ঠ হইবার পর দুইদিন শিশু চটচটে আঠাযুক্ত বাহ্য করে, প্রত্যেকবার বাহ্যের পর গরম জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া পাউডার লাগাইয়া দিবে, অপরিষ্কার থাকিলে ঘা হইতে পারে। মায়ের দুধ খাইলে শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য প্রায় হয়না মায়ের কোষ্ঠ কাঠিন্য হইলে শিশুদের বাহ্য সহজে হয় না, এরূপ হইলে মায়ের যা'তে পেট পরিষ্কার হয় তার ব্যবস্থা করিবে, মাকে ক্যাষ্টার অয়েলের জোলাপ দিবে। টাটকা ফল খাইতে দিবে, শিশুর তলপেটের ডান দিক হ'তে উপরের দিক দিয়া বাম দিকের নিচের মলদ্বার পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে ক্যাষ্টার অয়েল (রেড়ির তেল) মালিশ করিবে, মলদ্বারে নরম পানের বোটা দিলে বাহ্য হয়, বকুলের বিচি বাটিয়া গুহ্যদ্বারে দিলেও অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু রোজ রোজ এরূপ করা ভাল নয়, কেননা এই অভ্যাসের ফলে পরে আর পানের বোটা ইত্যাদি না দিলে বাহ্য হইবে না। শিশুর মল প্রথম দুই তিন দিন চটচটে আঠাযুক্ত পাটকেলে বর্ণের থাকে, পরে হরিদ্রা বর্ণের হয়, রোজ ৪।৫বার বাহ্য হয়। কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকেনা। যদি শিশুর মলের ভিতর জমাট দুগ্ধের কণা থাকে, টক গন্ধ বিশিষ্ট হয় তবে দুধ সহ্য হইতেছে না মনে করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শমত মা ও শিশুর খাবার ব্যবস্থা করিবে।

শিশুর নিদ্রা—

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর দিন ও রাত্রের ভিতর অনেক সময় ঘুমায়, ক্ষুধা পাইলে শিশু কাঁদে, খাইয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়ে, খাবার সময় ছাড়া, গলা শুকাইয়া পিপাসার জন্য, বিছানার অসুবিধার জন্য, আতুড়ঘর নোংরা থাকার জন্য পিপড়ার কামড়ে, গরম বা ঠাণ্ডা লাগার দরুণ, পেট বেদনা, কান বেদনা অথবা নাভি পাকিলে শিশু কাঁদে, স্তন দিলেও শান্ত হয় না। তখন ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, শিশু কাঁদে কেন? প্রস্রাবে বিছানা ভিজিয়া থাকায় শিশু অনেক সময়ে কাঁদে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইয়া থাকিলে পূর্ব্বলিখিত মত বাহ্যে করাইবে, পেটে গরম সেক দিবে, কান বেদনা হইলে একটু গরম সেক দিলে শিশু ঘুমাইয়া পড়িবে। পেটের পেটী খুলিয়া নাভির অবস্থা দেখিবে। রক্তস্রাব হইলে নূতন করিয়া পূর্ব্ব কথিত মত পেট বাঁধিয়া দিবে।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিনের নিদ্রা কমিতে থাকে, প্রাতে একবার ঘুমায়, ৯।১০টার সময় জাগে, স্নান ও খাওয়ার পর আবার ঘুমাইয়া পড়ে, বৈকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সন্ধ্যার পর আবার ঘুমাইয়া পড়ে, রাত্রে একবার জাগে। শিশুর এই প্রকার অভ্যাস হইলে সে প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট সময় ঘুমাইয়া থাকে। চুসনি মুখে দিয়া কখনও ঘুম পাড়ান উচিত নয়, ঘুমের ভিতরে চুসনি মুখ ইহতে পড়িয়া গেলে

শিশু হাঁ করিয়া ঘুমায়। সেইজন্য মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণের অভ্যাস করিয়া শিশু অসুস্থ হয়। খাবার পর দোল দিয়া ঘুম পাড়াইবার অভ্যাস করা ভাল নয়। এরূপ অভ্যাস করিলে শিশু ভবিষ্যতে দোল না দিলে ঘুমাইতে চাহে না, খাওয়াইবার পরই বিছানায় শোয়াইয়া দিলে অভ্যাস বশতঃ শিশু আপনা হইতেই ঘুমাইয়া পড়ে।

শিশুর বিছানা—

শিশুর বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বিশেষ আবশ্যক, ছোট তেষোকের উপর অয়েল ক্লথ দিয়া, তাহার উপর ছোট কাঁথা বা বিছানার চাদর ২।৩ ভাঁজ করিয়া তাহার উপর শিশুকে শোয়াইবে আঁতুড়ের ঝিকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, শিশু যেন প্রস্রাব করিয়া ভিজা বিছানায় শুইয়া না থাকে। গায়ে একখানা কাপড় দিবে, (শীত বা গরম সময়ে যখন যাহা উপযোগী)। প্রস্রাবের পরই বিছানার চাদর ও নেংটী বদলাইয়া দিবে, নাভি বাঁধিবার কাপড় ভিজিয়া গেলে তখনই বদলাইয়া দিবে। শিশুর মশারি কখনই মোটা কাপড়ের হওয়া উচিত নয়, নেটের মশারি হইলেই ভাল, তাহাতে বাতাস খেলিতে পারে।

শিশুর প্রস্রাবের কাঁথা কাপড় ইত্যাদি প্রত্যেক দিন সাবান ও গরম জল দিয়া ধুইয়া রৌদ্রে দিবে, অনেক মা শিশুর প্রস্রাবের কাঁথা কাপড় না ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লন, ইহা শিশুর পক্ষে বড়ই অনিষ্টজনক। শিশুর বিছানা প্রত্যেক

দিন রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রের রোগজীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে।

মাসী পিসি—

ভূমিষ্ঠ হইবার ২।৩ দিনের ভিতর শিশুদের শরীরে ঘামাচির মত লাল লাল বাহির হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর সরিষার তৈল মাখাইবার জন্য কাপড়ের ঘর্ষণে নরম চামড়ায় মাসীপিসি উঠে। ইহার জন্য ভাবিবার দরকার নাই, তু' তন দিন পরে মিলাইয়া যায়।

শিশুর তড়কা (convulsion)—

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার দুই সপ্তাহের ভিতর শিশুদের ফিট হয়, খাবার দোষে, পেটের গোলমালের জন্য, ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মাথায় আঘাত লাগিয়া, নাড়ী কাটার দোষে, নাড়ী পাকিয়া বা জ্বরের জন্য এইরূপ হইয়া থাকে ; এইরূপ হইলে গরম জলে শিশুর শরীর ডুবাইয়া মাথায় ঠাণ্ডা জল দিবে, পানের বোটা দিয়া পেট পরিষ্কার করিয়া দিবে, ফুটান জল খাইতে দিবে, চিকিৎসক ডাকিয়া তাঁহার উপদেশ মত চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

শিশুর সর্দ্দি কাশি—

সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে শিশুর সর্দ্দি কাশি হয় ; শিশু মাতৃ-গর্ভে গরমে থাকে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্যাঁতসেঁতে ঘরে বাস, স্নান করার সময় ঠাণ্ডা লাগায় ও উপযুক্ত গরম কাপড়ের অভাবে শিশুদের সর্দ্দি হয়। শিশুদের সর্দ্দি বিপদ-

জনক, অল্পতে না সারিলে ব্রঙ্কাইটিস্‌, নিউমোনিয়া প্রভৃতি হইতে পারে, তেল গরম করিয়া হাত পায়ে মালিস করিলে ও ইউকলিপটস্‌ অয়েল আঘ্রাণে সর্দ্দি সারিয়া যায়।

নাভি পাকা—

শিশুর নাড়ী কাটার পর সাধারণতঃ ৫ হইতে ৭ দিনের ভিতর নাড়ী শুকাইয়া যায়, যদি নাড়ী এইরূপে না পড়িয়া যায়, নাড়ী ভাল করিয়া না শুকাইয়া কাঁচা থাকে, নাড়ীতে পুঁজ হয়, নাভির চারিদিক শক্ত ও লালবর্ণ হইয়া উঠে, ইহা শিশুর পক্ষে বিপদজনক। নাড়ী কাটার দোষে নাড়ীতে ময়লা লাগা, নাড়ী খুলিয়া রাখা প্রভৃতি কারণে নাড়ী পাকে। এইরূপ হইলে বোরাসিক লোসন দিয়া নাড়ী পরিষ্কার করিয়া, টিংচার আইওডিন লাগাইয়া বোরিক জিঙ্ক পাউডার দিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। নাভিতে বোরিক লোসনের সেক দিবে। ইহাতে কমিয়া না গেলে ডাক্তার দেখাইবে।

শিশুর পেটের অসুখ—

মায়ের স্তন্য দুগ্ধের অভাবে গরুর দুধ খাওয়ান, বার বার খাওয়ান, মায়ের স্তন্যের বোটা না ধুইবার জন্য ; শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পাত্র, চামচ, পলিতা অপরিষ্কার থাকায় শিশুর পেট ফাঁপা, পেট কামড়ান অথবা পাতলা বাহ্যে হয়।

(১) মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে গরুর বা ছাগলের দুধ খাওয়াইতে হইলে, দুগ্ধের সঙ্গে জল, চিনি মিশাইয়া মায়ের

দুধের সমান গুণবিশিষ্ট করিতে হইবে। (পরবর্ত্তী চার্ট দ্রষ্টব্য)।

(২) শিশুকে যে মধু খাওয়ান হয় তাহা টাটকা হওয়া উচিত, কখনও পুরাতন মধু খাওয়াইবে না।

(৩) নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে দুধ খাওয়াইবে না, কাঁদি-লেই দুধ দিয়া শান্ত করিতে যাইয়া শিশুকে যেন অতিরিক্ত খাওয়ান না হয়।

(৪) শিশুকে ঘন দুধ দিবে না, এক বলক দুধ খাওয়াইবে।

(৫) দুধ খাওয়ান হইলে শিশুর মুখ, মায়ের স্তন, দুধের বাটি, ঝিনুক চামচ ইত্যাদি গরম জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া রাখিবে এবং খাওয়াইবার পূর্ব্বে আবার গরম জল দিয়া ধুইতে হইবে।

(৬) শিশুকে কখনও অতিরিক্ত খাওয়াইবে না।

(৭) পেট ফাঁপিয়া থাকিলে ক্যাষ্টর অয়েল মালিশ করিয়া গরম জলের সেক দিবে।

(৮) বাহ্যের ভিতর জমাট দুধের মত থাকিলে, ৩০ ফোটা ক্যাষ্টর অয়েল গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া খওয়াইবে।

সিফিলিস (গরমী)—

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, পিতামাতার এই ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধির জন্য বংশ পরম্পরায়, এই রোগের বিষ সংক্রা-মিত হইয়া থাকে। মায়ের গরমীর জন্য গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়,

শিশু জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হইলে ২।১ মাসের ভিতরই শিশুর শরীরে এই কুৎসিত ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(১) মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বারে ঘা হয়।

(২) মুখে ও গায়ে ঘা হয়, নাকের ভিতর ঘা শুকাইয়া শক্ত চলটা পড়ার মত হয়।

(৩) পাছার চামড়ায় এবং শরীরে বিভিন্ন স্থানে স্থানে চামড়ায় তামার রংএর মত দাগ হয়। এবং স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়ে।

(৪) শিশুর চক্ষের তারার কোন কোন স্থান শ্বেতবর্ণ হয়।

(৫) ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর ওজন কিছু কমিয়া যায়, শরীরের চামড়া শিথিল হইয়া কুচকাইয়া যায়। নাড়ী শুকাইয়া পড়িয়া যাইবার পর. আবার শিশুর ওজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শিশুর চামড়া স্বাভাবিক মসৃন হয়। কিন্তু যে শিশু মাতৃগর্ভ হইতে সিফিলিসের বিষ নিয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার চামড়া সঙ্কুচিত অবস্থাতেই থাকে, শিশু দিনের পর দিন শুকাইয়া যায় তার ওজন বৃদ্ধি হয় না।

(৬) শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

(৭) গায়ের রং হলদে হয়।

ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, এই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবে।

শিশুর চক্ষু ও মুখের রং হলদে হওয়া—

ভূমিষ্ঠ হইবার ২।৪ দিনের ভিতর শিশুর চক্ষু ও মুখের রং হলদে হয়, ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই, ইহা আপনিই সারিয়া যায়।

নবম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানব শিশু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পরনির্ভরশীল; অতএব তাহাদের প্রতিপালন বিষয়ে পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনের বিশেষ দায়িত্ব আছে। আমরা যদি সে দায়িত্ব উপযুক্তরূপে প্রতিপালন না করি এবং সেই দায়িত্ব প্রতিপালনের উপযুক্ত শক্তি অর্জ্জন না করি, তবে আমাদের মহাপাপ হয় এবং সমাজ-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শিশু পালনের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব মাতার, ভক্তকবি রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছিলেন,—

"মা হওয়া নয় কথার কথা,
কেবল প্রসব কর্‌লে হয় না মাতা।"

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে, আমাদের 'মা'দের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ অল্পেরই আছে। 'মা'দের অজ্ঞতায়, দায়িত্ববোধের অভাবে ও নানা কারণে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য দেশ হইতে ৪ গুণেরও বেশী। কলিকাতা সহরে যত শিশু জন্মে তার তিন ভাগের এক ভাগ, কয়েক ঘণ্টার ভিতরই মারা যায়।

১ মাসের	শিশু মৃত্যু	শতকরা	৫১	জন
১-৬ মাসের	”	”	৭৬	”
৬-১২ ”	”	”	২৩	”

বিভিন্ন কারণে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা।

অকাল প্রসব জনিত	মৃত্যু	শতকরা	১১.১	জন
প্রসব কালে দুর্ব্বলতায়	”	”	১৯.৪	”
ধনুষ্টঙ্কার	”	”	১৩.৭	”
ব্রঙ্কাইটীস্	”	”	৩৩	”
উদরাময়	”	”	৫.৪	”
যকৃত পীড়া	”	”	২.৬	”
অন্যান্য কারণ	”	”	১২.২	”

উপরে লিখিত সংখ্যাদ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে আমাদের দেশে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর ৬ মাসের ভিতর বেশী মারা যায়; আঁতুড়ে যে যে কারণে শিশুর মৃত্যু হয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আঁতুড়ে এবং তার পর সন্তান পালনের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের মেয়েদের ভিতর সেই শিক্ষার অভাবেই আমাদের বাংলায়

ইং ১৯২২ সালে	মোট শিশুমৃত্যু	২,৩৯,৪৫১,
ইং ১৯২৩ সালে	”	২,৫৩,৬৯৪,
ইং ১৯২৪ সালে	”	২,৫২,৩৩৭ টী

ঘটিয়াছে, শিশু পালন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই এত শিশুর মৃত্যুর কারণ।

শিশুর দেহ

নিম্নে শিশু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ও তাহার পালন সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করা হইয়াছে।

শিশুর ওজন—

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে শিশুর ওজন নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি হয়। মাঝে মাঝে শিশুকে ওজন করিয়া তার বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, শিশুর স্বাস্থ্য ভালর দিকে কি মন্দের দিকে যাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি বৃদ্ধি না হইয়া ওজন কমিয়া যায়, তবেই শিশুর রোগ হইয়াছে, অথবা উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শিশুর ওজন জন্মকালীন		/৩৸	সের	বৃদ্ধি	
১	মাস	/৪	,,	/।	পোয়া
২	,,	/৬	,,	/২	সের
৩	,,	/৬।	,,	/।	পোয়া
৪	,,	/৭।	,,	/১	সের
৫	,,	/৭৸	,,	/৸	পোয়া
৬	,,	/৮	,,	/।	,,
৭	,,	/৮।	,,	/।	,,
৮	,,	/৮॥	,,	/।	,,
৯	,,	/৮৸	,,	/।	,,
১০	,,	/৯।	,,	/॥	,,
১১	,,	।०	,,	/৸	,,

ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শিশুর যে ওজন থাকে ৩।৪ দিনের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধসের কমিয়া যায়, পরে সাত দিনের মধ্যে অর্দ্ধ সের বৃদ্ধি পায়।

শিশুর শরীরের উচ্চতা।—

ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সাধারণতঃ ১৯ হইতে ২০ ইঞ্চি লম্বা হয়, ষষ্ঠ মাসে ২৪ ইঞ্চি, ১ বৎসর বয়সে ২৮ ইঞ্চি, ২ বৎসর বয়সে ৩০ ইঞ্চি লম্বা হয়, তৎপর ১২ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর ২ হইতে ৩ইঞ্চি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সুস্থ অবস্থায় শিশু লম্বা হয় এবং ওজন নিয়মিতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, রোগ ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশু আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশুর টন্‌সিল বড় থাকে, সেই সব শিশুদের বৃদ্ধি কম, টন্‌সিল কাটাইয়া দিলে শিশু নিয়মিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শিশুর খাদ্য

মায়ের দুধই শিশুদের স্বাভাবিক খাদ্য, ভগবান শিশুর জন্য এই খাদ্যের ব্যবস্থা মাতৃস্তনে করিয়া রাখিয়াছেন; যে সন্তান মাতৃস্তন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয়, সেই শিশুর শরীরই সবল ও সুস্থ হয় এবং ঐ মাতৃস্তন্যই তাহার ভাবী জীবনের পক্ষে অশেষ কল্যাণের কারণ হয়। কোন কোন মাতা সন্তানকে নিজের স্তন না দিয়া ধাত্রীর স্তন্য-দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মায়ের বুকে দুধ থাকা সত্ত্বেও যে মাতা নিজ সন্তানকে দুধ না দেয়, তার মত দুর্ভাগিনী মাতা এবং মাতৃ-স্তন্য হইতে বঞ্চিত সেই সন্তানের মত ভাগ্যহীন সন্তান আর

কেহ নাই। সন্তানকে দুধ দিলে মায়ের জরায়ুও স্বাভাবিক ভাবে সঙ্কুচিত হয়। ৭ মাস পর্য্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর খাদ্য, যদি এই সময়ের মধ্যে মায়ের দুধের দ্বারা শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তবে অন্য দুধ দেওয়া উচিত নয় কিন্তু মাতৃস্তন্য যথেষ্ট না হইলে, গরুর দুধ ও ছাগলের দুধ জল মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ৭ মাসের পর হইতে অন্য দুধ অভ্যাস করা যাইতে পারে। নবম মাস হইতে মায়ের দুধ ছাড়াইয়া দেওয়া ভাল। এই সময় হইতে মায়ের দুধ পাতলা হয়। শিশুর পুষ্টির জন্য মাতৃস্তন্যে যে যে উপাদান থাকে তাহা কমিয়া যায়। এবং সন্তানকে দুধ দিতে যাইয়া মাতা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। মায়ের যদি কোন কঠিন ব্যাধি হয় বা মা যদি গর্ভবতী হন, তাহা হইলে নবম মাসের পূর্ব্বেও দুধ ছাড়ান উচিত।

মায়ের দুধ খাওয়াইবার নিয়ম—

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, প্রথম দুই দিন মায়ের স্তনে দুধের মত আঠা আঠা এক প্রকার রস নির্গত হয়। তৃতীয় দিন হইতে দুধ আসে। মায়ের স্তন দিবার নির্দ্দিষ্ট ধরা বাঁধা সময় থাকা, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, প্রথম হইতে অভ্যাস করিলে শিশুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুম ভাঙ্গিবে. যখন তখন কাঁদিয়া মাকে বিরক্ত করিবে না, এবং তাঁহারও বিশ্রামের অভাব হইবে না।

প্রথম দিনে ৬ঘণ্টান্তর, ২য় দিনে ৪ঘণ্টান্তর দুধ খাওয়াইবে।

প্রত্যেক স্তন ৫মিনিট কাল টানিতে দিবে, রাত্রি ১০টার পর হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে একবার মাত্র স্তন দিবে।

৩য় দিন হইতে নবম মাস পর্য্যন্ত দিনে ৩ ঘণ্টান্তর স্তন দিবে, রাত্রি ১০টার পর হইতে প্রাতে ৬ টার ভিতর একবার দিবে। প্রত্যেকবার ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল প্রত্যেক স্তন টানিতে দিবে।

বিশেষ প্রয়োজন না হইলে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম করিবে না, পিপাসার জন্য গলা শুকাইয়া শিশুরা অনেক সময় কাঁদে, তখন পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়মানুযায়ী, ফুটান মিছরির জল দিবে।

মাতৃ দুগ্ধের অভাবে শিশুর খাদ্য—

গরু বা ছাগলের দুধ মায়ের দুধের মত সমগুণবিশিষ্ঠ নয়, ভগবান্ মায়ের স্তনের দুধের ভিতর যে উপাদান যে পরিমাণ দিয়াছেন, তাহাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক খাদ্য, শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দুধেরও উপাদান পরিবর্ত্তিত হয়, অতএব আমরা যখনই মায়ের দুধের পরিবর্ত্তে অন্য দুধ ব্যবহার করিব, তখনই মায়ের দুধের যে যে উপাদান যত পরিমাণ আছে, সেই দুধের ভিতর জল, চিনি ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া মায়ের দুধের মত উপাদান বিশিষ্ট করিতে পারিলেই শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকিবে।

বিভিন্ন দুধের উপাদান।

শতকরা

	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	জল
গো দুগ্ধ	৪'৪৭	৩'১৪	৪'৭৫	৮৭'০৩
ছাগ দুগ্ধ	৪'৬৭	৭ ০২	৫'২৮	৮২'০২
মাতৃ দুগ্ধ	১'৫০	৩'৫৬	৬'৫০	৮৭'৯৭

উপরের লিখিত চার্টে মায়ের দুধের সঙ্গে অন্য সব দুধের উপাদানের প্রভেদ দেখান হইল। মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণ মাখন আছে তাহা প্রায় গোদুগ্ধের সমান, গোদুগ্ধ হইতে মাতৃদুগ্ধে শর্করার ভাগ কিছু বেশী, কিন্তু মাতৃদুগ্ধ হইতে গোদুগ্ধে ছানার পরিমান বেশী ; অতএব গোদুগ্ধের এই ছানার ভাগকে কমাইবার জন্য জল মিশান বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু জল মিশালেই গোদুগ্ধের শর্করা ও মাখনের ভাগ কমিয়া যায়, তজ্জন্য জলমিশ্রিত গোদুগ্ধের সহিত কিছু পরিমাণ ক্রিম ও চিনি মিশাইয়া মাতৃদুগ্ধের উপাদানের সমান করিতে হয়।

অষ্টম অধ্যায়ে ৭২ পৃষ্ঠায় ক্রিম প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ক্রিম প্রস্তুত করিবার দুধ পরিষ্কার ও টাটকা হওয়া উচিত। দুধ টাটকা না হইলে তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য।

শিশুর জন্য ২৪ ঘণ্টার পরিমাণ গোদুগ্ধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—

বয়স	গোদুগ্ধ	জল	চিনি	ক্রিম
দ্বিতীয় মাস	৪॥ আউন্স	১৪ আউন্স	১ আউন্স	৪॥ আউন্স
তৃতীয় মাস	৪॥ "	১৭ "	২ "	৬॥ "
চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ মাস	৫॥ "	২০ "	২॥ "	৮ "

(২৪ ঘণ্টার দুধ একবারে প্রস্তুত না করিয়া, দিনে ২ বার প্রস্তুত করা ভাল)।

যদি কোন মা দুধের সঙ্গে ক্রিম মিশাইবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে না চান, তবে যে পরিমাণ ক্রিম মিশাইবার কথা বলা হইল তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ দুধের পাৎলা সর মিশাইবেন।

সপ্তম মাস হইতে দুধে জল মিশাইবার প্রয়োজন নাই, শিশুর খাঁটী গরুর দুধ সহ্য না হইলে, যতটা দুধ তার চারিভাগের একভাগ জল মিশাইয়া লইবে।

ছাগদুগ্ধ—

গরুর দুধ অপেক্ষা ছাগলের দুধ শিশুদের সহজে পরিপাক হয়, পাশ্চাত্য দেশে মাতৃ দুগ্ধের অভাবে ছাগলের দুধই

অধিকাংশ শিশুকে দেওয়া হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় ইহা দেখিয়াছি যে শিশুর গরুর দুধ সহ্য হয় না, ছাগলের দুধ তাহার সহ্য হয়।

ছাগলের দুধে মাখনের ভাগ, গোদুগ্ধ ও মাতৃদুগ্ধ হইতে বেশী আছে, তজ্জন্য জল মিশ্রিত ছাগলের দুধে ক্রিম মিশাই-বার প্রয়োজন হয় না, মাত্র চিনি মিশাইলেই হয়।

নিম্ন লিখিত পরিমাণে ছাগলের দুধের সঙ্গে জল ও চিনি মিশ্রিত করিতে হয়।

	ছাগ দুগ্ধ	চিনি	জল
দ্বিতীয়, তৃতীয় মাস	১০ আউন্স	১ আউন্স	২০ আউন্স
৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ মাস	১২ ”	১ ” ২ ড্রাম	২০ ”
৭ হইতে ১২ মাস	১৪ ”	১॥ ”	২০ ”

শিশুর পরিপাক শক্তির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া জলের পরি-মাণ কমাইতে ও বাড়াইতে হয়।

শিশুকে খাওয়াইবার নিয়ম পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা—

শিশুকে কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিমাণ দুধ খাওয়াইলে চলিবে না, দুধের বিশুদ্ধতার উপর শিশুর জীবন নির্ভর করে, অপরিষ্কার দুধ, বাসী দুধ রোগজীবাণুদুষ্ট দুধ শিশুর পক্ষে মারাত্মক।

শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত বলিয়াই যে, মাতৃদুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহা নহে, আরও একটী কারণে ইহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—শিশু মুখ দিয়া মাতৃস্তন্য আপনি টানিয়া নেয়, এই

বয়স	সময়		২৪ ঘণ্টায় কতবার	প্রত্যেক বারের পরিমাণ	
	দিনে	রাত্রে		বাংলা ওজন	ইংরাজী ওজন
২য় মাস	২॥ ঘণ্টা অন্তর	১ বার	৭	১॥—২ ছটাক	৩—৪ আউন্স
৩য় মাস	৩	,,	৬	২—২॥ ,,	৪—৫ ,,
৪র্থ ৫ম মাস	৩	,,	৬	২॥—৩ ,,	৫—৬ ,,
৬ষ্ঠ হইতে ৭ম মাস	৩॥	,,	৫	৩—৪ ,,	৬—৮ ,,
১০ম হইতে দ্বাদশ মাস	৪	,,	৪	৪—৪॥ ,,	৮—৯ ,,

জন্য উক্ত দুধের ভিতর বাহিরের কোন রোগ-জীবাণু বা বিষ প্রবেশ করিতে পারে না। গরুর দুধ, ছাগলের দুধ, পাত্রে দোহন করিবার সময় এবং পরে বাহিরের হাওয়ায়, পাত্রের জলে, গো ছাগল দোহনকারীর হাতে, যে বিষ বা রোগজীবাণু থাকে, তাহা অনায়াসেই দুধের সঙ্গে মিশিতে পারে। তজ্জন্যই সকল দুধ অপেক্ষা মায়ের দুধ নিরাপদ। কেন না ইহাতে কোন প্রকারে বাহিরের রোগ-

জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে না। বিলাতে মায়ের দুধের পরিবর্ত্তে অনেকেই ছাগলের দুধ শিশুকে দিয়া থাকেন কিন্তু উক্ত দুধ কোন পাত্রে দোহন করা হয় না, শিশুই ছাগলের দুধ মায়ের স্তন টানিবার মত নিজেই টানিয়া নেয়।

দুগ্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সতর্কতা নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।—

(১) গরু বা ছাগলের স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা দেখিতে হইবে।

(২) যে গরুর দুধ শিশুকে দিতে হইবে সেই গরুর বাছুর শিশুর সমান বয়সের হওয়া আবশ্যক।

(৩) প্রত্যেক দিন একই গরুর দুধ দিবে।

(৪) যে সব গরু সর্ব্বদা ঘরে বাঁধা থাকে, তাহা অপেক্ষা যে গরু রৌদ্রে বাতাসে বিচরণ করিয়া মাঠে ঘাস খায় তাহার দুধ ভাল। কলিকাতায় এক প্রকার দুধ বিক্রয় হয় উহাকে ফুঁকার দুধ বলে, এই সকল গাভীর বাছুর অল্পবয়সেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। এই দুধ শিশুর পক্ষে বড়ই অনিষ্টকারী। এই দুধ খাইয়া কলিকাতার অধিকাংশ শিশু যকৃতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রকারের দুধ এবং যে গরুর বাছুর মারা গিয়াছে তাহার দুধ শিশুকে কখনই দিবে না।

উপযুক্ত আহারের অভাবে দুর্ব্বল ও রুগ্ন গরুর দুধ

খাইলে শিশু ভবিষ্যতে দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়। অতএব শিশুকে সর্ব্বদা সুস্থ, সবল গরুর দুধ দিবে।

(৫) গাভী দোহন করিবার পূর্ব্বে গরম জলে গাভীর বাঁট ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। দোহনকারীর হাতে কোন প্রকার ঘা, চর্ম্মরোগ না থাকে তাহা দেখিবে। দোহনকারীর হাত ও যে পাত্রে দুধ দোহন করিবে তাহা ফুটান গরম জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

(৬) গরুর বা ছাগলের দুধ এক বলক ফুটান ভাল, বেশী ফুটাইলে দুধ গুরুপাক হয় ও তাহার খাদ্যবীর্য্য (ভিটামিন) নষ্ট হইয়া যায়। কাঁচা দুধের ভিতর খাদ্যবীর্য্য বেশী থাকে, তাই বিলাতে অনেকেই কাঁচা দুধ খাইয়া থাকেন। বিলাতে দুধ দোহনের সময় যেরূপ সতর্কতা গ্রহণ করা হয় এবং যেরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে দোহন করা হয় তাহাতে হাত কখন দুগ্ধ স্পর্শ করে না, সেই কাঁচা দুধ খাইলে অনিষ্ট হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে সেইরূপ সতর্কতা নেওয়া হয় না বলিয়া দুধ ফুটাইয়া খাওয়াই ভাল।

ধাত্রীর দুগ্ধ—

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার শরীর গঠনের উপযোগী করিয়া ভগবান মাতৃদুগ্ধ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। অন্য দুগ্ধে তাহা সম্ভব নহে। এই জন্য মাতৃদুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাত মাস পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যে শিশু প্রতিপালিত হইতে পারিলে অন্য দুগ্ধ দেওয়া ভাল নয়।

মা অসুস্থ হইলে অথবা মাতৃস্তনে দুধ না থাকিলে শিশুকে ধাত্রীর দুধ দিতে পারিলে গরু, ছাগলের দুধ বা পেটেণ্ট ফুট না দেওয়াই ভাল হয়। কিন্তু ধাত্রীর সন্তানের বয়স শিশুর সমান হওয়া কর্ত্তব্য। ধাত্রী অল্প বয়স্কা এবং তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকা চাই।

পেটেণ্ট ফুড—

বর্ত্তমান সময়ে বাজারে নানা প্রকার পেটেণ্ট ফুড বিক্রয় হয়। এই সকল ফুডের ভিতর এমন কিছু থাকেনা, যাহা দ্বারা শিশুর দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সাধন হইতে পারে। আপাততঃ ইহা ব্যবহারে শিশু একটু হৃষ্টপুষ্ট হইলেও সে স্বাভাবিক শক্তি সে লাভ করিতে পারে না। শিশুর শরীরে চর্ব্বি বৃদ্ধি হয় মাত্র। বেশী দিন একমাত্র পেটেণ্ট ফুড ব্যবহারে রিকেটস্ রোগ জন্মিতে পারে, এই রোগে অস্থি (হাড়) শক্ত হয় না, সেই জন্য শিশু দাঁড়াইতে পারে না, চলিতে অক্ষম হয়।

যদি অসুখের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন পেটেণ্ট ফুড ব্যবহার করিতে হয়, তবে আবশ্যকানুযায়ী ২।৪ দিনের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়।

দুগ্ধ খাওয়াইবার পাত্র—

দুধ খাওয়াইবার পাত্র সর্ব্বদা পরিস্কার রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। পাত্র উত্তমরূপে গরম জলে পরিস্কার করিয়া শিশুর আহারের পরিমাণ দুধ ফুটাইয়া তাহাতে রাখিবে। দুধ

খাওয়াইবার ঝিনুক, চামচ, মায়ের হাত, ভাল করিয়া গরম জলে ধুইয়া লইবে। দুধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে শিশুর মুখ গরম জল দিয়া পরিস্কার করিয়া তার পর দুধ খাওয়াইবে।

শিশুর দুধের উপর অথবা যে পাত্রে দুধ খাওয়াইবে তাহার মধ্যে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মাছির পায়ে, শরীরে, অসংখ্য রোগ-জীবাণু, (রোগের বিষ) ময়লা প্রভৃতি থাকে। মাছি দুধের উপর বসিলেই সেই দুধ বিষাক্ত হয় অতএব. সাবধান, মাছি যাহাতে বসিতে না পারে তাহা দেখিবে।

যে সময় ঘর ঝাট দেয়, অথবা যে ঘরে ধূলা উড়িতেছে, যে ঘরের কাছে পচা দুর্গন্ধ জিনিষ আছে, তথায় বসিয়া দুধ খাওয়াইবেনা। বিড়াল শিশুদের ভয়ানক শত্রু। দুধ দেখিলেই বিড়াল অনেক সময়েই তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুধে মুখ দেয়। বিড়ালের মুখে এক প্রকার বিষ আছে, বিড়ালের গায়ে ধূলা ও লোম উড়িয়া দুধ বিষাক্ত করিয়া দেয়, অতএব বিড়াল নিকটে আসিতে দিবে না।

দুধ খাওয়াইবার বাটী, চামচ, ঝিনুক ইত্যাদি গরম জলে ভাল করিয়া ধুইয়া, বাটী উল্টা করিয়া রাখিয়া দিবে যেন মাছি, ধূলা না পড়িতে পারে।

বোতলে দুধ খাওয়ান—

ঝিনুক, চামচ দিয়াই দুধ খাওয়ান ভাল, আজকাল অনেকে বোতলে দুধ খাওয়ান শিশুদের অভ্যাস করেন। দুধ

খাওয়াইবার পর বোতলের গায় ও রবারের নলের ভিতর দুধের মাখন লাগিয়া থাকে এবং আমাদের গরম দেশে সহজে উহা নষ্ট হইয়া যায়। দুধ খাওয়াইবাব পর বোতল গরম জল দিয়া, ব্রাস দিয়া ঘসিয়া পরিস্কার না করিলে পরে আবার যখন শিশুকে দুধ খাইতে দিবে তখন গরম দুধের সঙ্গে গায়ে লাগা ঐ নষ্ট দুধ শিশুর উদরস্থ হইয়া অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি করিবে। অতএব বোতোলে দুধ খাওয়াইতে হইলে প্রত্যেক-বার ব্যবহারের পর বোতল, রবারের চুসনি গরম জলে ধুইয়া ব্রাস দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া, জলের ভিতর বোতল ডুবাইয়া রাখিবে।

বড় নখ—

অনেক মা ঝিয়ের উপর শিশুর দুধ খাওয়াইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। দুধের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন অশিক্ষিতা ঝিয়েরা তাহা করিবে না, সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে মায়ের উপর বিধাতা-পুরুষ শিশুপালনের যে দায়িত্ব দিয়াছেন তাহা পালন করিবার জন্য, সকল সময়ই মায়ের নিজের হাতে দুধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। যাঁহারা দুধ খাওয়াইবেন, তাঁহাদের হাতে যেন বড় নখ না থাকে; কেননা বড় নখের ভিতর ময়লা এবং নানা প্রকার রোগ জীবাণু লুক্কায়িত থাকে, দুধ খাওয়াইবার সময় ঐ বিষ দুধের সঙ্গে মিলিত হইয়া শিশুর উদরস্থ হওয়ায় তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়।

মায়ের স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধির উপায়—

মায়ের স্তন্যদুগ্ধের অভাবে গরুর দুধ, ছাগলের দুধ, পেটেণ্ট ফুডের আবশ্যক হয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করা ভাল যাহাতে মায়ের স্তনে দুধের সঞ্চার হয়। মায়ের শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলেই যথেষ্ট দুধ হয়। যে গর্ভিণী গর্ভাবস্থায় আবশ্যক মত পুষ্টিকর খাদ্য ও যথেষ্ট দুধ খাইতে পারেন, সাধারণতঃ তাঁহার স্তনে দুধ হয়। প্রসবের পর দুধ, দুধ সাগু প্রত্যেক দিন নিয়মিত খাইলে এবং ভাতের সঙ্গে সিঙি মাছের ঝোল, কল্মী শাক সিদ্ধ করিয়া তাহার ঝোল (শাক বাদ দিয়া) খাইলে স্তনে দুধ বৃদ্ধি হয়।

শিশুর দাঁত উঠা—

সাধারণতঃ ৬।৭ মাস হইতে শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। ১॥০ বৎসরের মধ্যে শিশুর সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী দাঁত উঠিয়া থাকে। সর্ব্বদা দাঁত পরিস্কার রাখিতে হয়, প্রত্যেকবার আহারের পর, ভাল করিয়া মুখ ধোয়াইবার সঙ্গে দাঁত পরিস্কার করিতে হইবে। আহারের পর ভাল করিয়া দাঁত পরিস্কার না করিলে, খাদ্য দ্রব্যের যে সব কণা মুখে ও দাঁতের ফাঁকে সঞ্চিত থাকে, তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ হয়, এবং পচা জিনিষ পেটের ভিতর গিয়া অজীর্ণ (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) রোগ জন্মায়। প্রত্যেক দিন প্রাতে দাঁতের মাজন দিয়া দাঁত পরিস্কার করিয়া দিবে, অল্প বয়সে টুথব্রাস (Tooth brush) ব্যবহার করা উচিত নয়।

দাঁত উঠিবার পর খাদ্য গ্রহণ—

দাঁত উঠিবার পর শিশুর খাদ্য দ্রব্যের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দাঁত উঠিলে পর সাগু, বার্লি, ভাতের ফেন ও গলা ভাত অল্প অল্প দেওয়া উচিত। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে এ সকল খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। কারণ তখন শিশুর এ সকল পরিপাক করিবার শক্তি হয় না।

স্তন ছাড়াইবার পর খুব গলা ভাত, ডাইলের ও মাছের ঝোলের সঙ্গে খুব ভাল করিয়া চট্‌কাইয়া শিশুকে দিনে একবার দিবে। মধ্যে মধ্যে সুজির রুটি দুধে ভিজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুধই শিশুর প্রধান আহার। দুই বৎসরের পর আলু সিদ্ধ, কাঁচা কলা, ফুল কপি, পটলের ঝোল, টাট্‌কা ঘি বা মাখন, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম খাইতে দিবে। শিশুকে কখনই বাজারের খাবার খাইতে দেওয়া ভাল নয়, ঘরে তৈয়ারী মোহন ভোগ, সুজির মিষ্টান্ন দিবে। শিশুকে কখনই চা খাইতে দিবে না, ইহাতে শিশুর হজম শক্তি কমিয়া যায়, ভবিষ্যতে ডিস্পেপ্‌সিয়া রোগে ভুগিতে হয়। শিশুকে কখনই বাসি জিনিষ দিবে না। শিশুর আহার্য্য সর্ব্বদা টাট্‌কা ও পরিষ্কার হওয়া কর্ত্তব্য। শিশুকে প্রত্যেক দিন কিছু ফল খাইতে দিতে পারিলে ভাল হয়।

অনেক বার ও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার—

অনেক পরিবারে দেখিতে পাই, শিশুর আত্মীয়েরা আদর করিয়া, শিশুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আহার করিয়া থাকেন,

ইহার ফলে যে যখন খাইতে বসে, তখনই শিশুর ডাক পড়ে। সে পিতার সঙ্গে, ঠাকুরদাদার সঙ্গে, পিসিমা, দিদিমার সঙ্গে বসিয়া খাইয়া থাকে, ইহাতে তাহাকে অনেকবার ও অনেক বেশী খাইতে হয়। ফলে শিশু যতটা আহার করে, ততটা হজম করিতে পারে না, অল্প দিনের ভিতর অজীর্ণ (ডিস্‌পেপসিয়া) রোগগ্রস্ত হয়, বার বার বাহ্যে করে। যাহা খায় তাহাতে শিশুর দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় না, অভ্যাস বশতঃ বেশী খাইতে পারে মাত্র কিন্তু তাহাতে দেহের বিকাশ সাধিত হয় না, কেবল উদর যন্ত্রটী বেশ বড় হয়। শিশুর পক্ষে এই যে অনির্দ্দিষ্ট সময়ে বার বার খাওয়া, ইহার মত অনিষ্টজনক আর কিছু হইতে পারে না। শিশুকে সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাওয়াইবে। অতিরিক্ত ভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শিশুর পোষাক—

শিশুর পোষাক সাদা সিধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার, দামী পোষাকের আবশ্যকতা নাই। অনেক সময় দেখিতে পাই বাড়ীতে শিশুর শরীরে কোন প্রকার জামা দেওয়া হয় না, কিন্তু কোথাও যাইতে হইলে কোট প্যাণ্ট পরাইয়া মাথায় টুপী দিয়া শিশুকে লইয়া যাওয়া হয়, অনভ্যাস বশতঃ শিশু তখন অস্বস্তি বোধ করে। শিশুকে সর্ব্বদা পাতলা কাপড়ের ঢিলা জামা গায়ে দিয়া রাখা ভাল, গরম দেশে আঁটা সাঁটা কোট প্যাণ্ট কখনই ভাল না। প্রত্যেক দিন স্নানের সময় শিশুর জামা ধুইয়া দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। সন্ধ্যার

সময় আবার জামা পরিবর্ত্তন করা ভাল, নচেৎ সারাদিনে যে জামা ধূলা বালিতে ময়লা হইয়াছে ও ঘামে সিক্ত হইয়াছে, সমস্ত রাত্রি তাহা গায়ে থাকিলে শিশুর অনিষ্ট হয়। বর্ষার সময় একটু মোটা সূতার কাপড়ের জামা গায়ে দিবে, শীতকালে গরম জামা ব্যবহার করিবে। অনেকে শীতের দিনে শিশুদের পায়ে গরম মোজা, মাথায় পশমের টুপী, গায় গরম জামা দিয়া থাকেন, কিন্তু পাছার দিকে কোন গরম ইজার পরান হয় না, ইহাতে পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুর পেটের অসুখ করে, আমাদের গরম দেশে মাথায় টুপী দিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ পশমের টুপীতে মাথা গরম হয়।

শিশুর বিছানা—

পূর্ব্বঅধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, প্রত্যেক দিন শিশুর বিছানা রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রের রোগজীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে। প্রস্রাবের কাঁথা সাবান দিয়া ধুইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। রাত্রে দিনে শিশু যখনই প্রস্রাব করিয়া বিছানা ভিজাইবে, তখনই ভিজা নেংটি ও শুইবার ভিজা কাঁথা বদ্‌লাইয়া নেংটি পরাইবে, এবং শুক্‌না কাঁথায় শিশুকে শোয়াইবে। গদির উপর একটুকরা অয়েল ক্লথ বিছাইয়া তাহার উপর পাৎলা চাদর বিছাইয়া দিলে প্রস্রাবে গদি ভিজিবে না।

শিশুর ঘুম—

ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুদের কয়েক দিন ২০ ঘণ্টা, এক বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৪ ঘণ্টা, ১ হইতে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত ১২।১৩ ঘণ্টা এবং বালকদের দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুমাইলে যথেষ্ট হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় শিশুদের ঘুমানো অভ্যাস করা উচিত, কোলে দোল দিয়া বা বেড়াইয়া ঘুম পাড়ান অভ্যাস করা ভাল নয়। ঐইরূপ করিলে আর বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে চাহিবে না। ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়ান উচিত নয়। ইহাতে শিশুরা ভীরু হয়; স্বপ্নে ভয় পায়। মশা মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছোট মশারীর ভিতর শোয়াইবে।

স্নান—

শিশুকে প্রত্যেক দিন স্নান করাইবে, স্নান করিলে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়। আহারের পূর্ব্বে স্নান করান ভাল, আহারের অব্যবহিত পরে স্নান করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। স্নানের পূর্ব্বে বেশ ভাল করিয়া গায়ে তেল মাখাইয়া দিবে, তেল মাখিয়া স্নান করিলে স্নানের সময় গায়ে ঠাণ্ডা কম লাগে।

ছয়মাস পর্য্যন্ত ঈষৎ উষ্ণ গরম জলে স্নান করাইবে, পরে ঠাণ্ডা জলে অভ্যাস করাইবে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। প্রত্যেক দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান করাইবে। সাবান ব্যবহার করিলে ভাল সাবান ব্যবহার করা উচিত। তেল মাখাইয়া স্নান করিবার সময় একটু সাবান দিলে,

তেলটা ভাল করিয়া উঠিয়া যায়। তেল এমন করিয়া মাখাইবে যেন শরীরের ভিতর বসিয়া যায়। চামড়ার উপরে তেল চট্‌চটে করিলে কিছু উপকার হয়না বরং বিছানা ও জামা শীঘ্র ময়লা হয়। সর্দ্দি হইলে, শরীর অসুস্থ বোধ করিলে স্নান না করাইয়া গরম জলে শরীর মুছিয়া দেওয়া ভাল, মাথা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া দিবে।

শিশুর ব্যায়াম—

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া হাত পা নাড়ে, বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত পা ছুড়িতে থাকে, ইহাই তাহার পক্ষে ব্যায়াম এবং এই হাত পা সঞ্চালনই তাহার দেহবর্দ্ধনের ও বল সঞ্চারের সাহায্য করে। ৩ হইতে ৪ মাসের ভিতর শিশু মাথা তুলিতে পারে, ৬।৭ মাসে একটু একটু বসিতে পারে, ৯।১০ মাসে সোজা হইয়া বসে। ১০।১১ মাসে অন্যের সাহায্যে একটু চলিবার চেষ্টা করে। ১৪।১৫ মাসে একটু বেড়ায়, ১৮ মাসে বেশ হাটিতে শিখে। তারপর শিশু বেশ ছুটাছুটি করিয়া থাকে। ইহাই প্রথম অবস্থায় তাহার ব্যায়াম। ইহার পর সঙ্গীদিগের সহিত অথবা পরিবারস্থ লোকের সঙ্গে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছেলেদের খেলা করা উচিত। খেলার ভিতর দিয়া শরীর সঞ্চালনে শিশুর দেহ সুস্থ ও সবল এবং মন প্রফুল্ল হইবে।

দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী পিতা মাতার আদর্শ—শান্ত শিষ্ট, সর্ব্বদা পড়াশুনা প্রিয়, নিরীহ সন্তান। ছেলে পাশ না

করিলে পিতা মাতা যতদূর দুঃখিত হন এত আর কিছুতেই নহে। তাই তাঁহারা ছেলেদের পড়াশুনাই পছন্দ করেন, খেলা ধূলা দেখিলে বিরক্ত হন। ইহারই ফলে ছেলেরা পিতামাতার ভয়ে শান্ত শিষ্ট হইতে যাইয়া, শরীর সঞ্চালনের অভাবে অল্প বয়সেই স্বাস্থ্য ভগ্ন করে, এবং তাহাদের দেহ মনের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

শিশুরা আপন গৃহে যখন খেলার সঙ্গী না পায় তখনি তাহারা সঙ্গীর অন্বেষণে বাহিরে যায়। পিতা মাতার দৃষ্টির বাহিরে যাইয়া খেলার সময়ে অনেক দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে বাধ্য হয়, এবং ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার মন্দ অভ্যাস শিক্ষা করে। এই জন্য ১২।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব বালকদিগকে নিজ গৃহে পিতা মাতা, ভাই বোনদের সঙ্গে, পিতা বা মাতার তত্ত্বাবধানে খেলার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিশেষ সুফল হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মন্ত্রী মহামতি গ্লাডষ্টোন নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও প্রত্যেক দিন পরিবারস্থ শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতেন। আমাদের অনেকের ধারণা বালকদের সঙ্গে এইরূপ ভাবে মিশিলে সন্তানেরা ভয় করিবে না। ভয়ের দ্বারা সন্তানের উপরে প্রভাব বিস্তার করা যায় না, পিতা মাতার চরিত্রই সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভয়ের শাসন বড় হইলে নষ্ট হইয়া যায়। শ্রদ্ধার প্রভাব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব পিতা মাতা সর্ব্বদা যেন সন্তানের খেলার সঙ্গী হইতে চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংক্রামক ব্যাধি বা ছোঁয়াচে রোগ।

বসন্ত, কলেরা, ডিসেণ্ট্রী (আমাশয়), হাম, ডিপ্‌থেরিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি ; বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে ইহাদের হাত হইতে শিশুদের রক্ষা করা উচিত। বাড়ীতে বা প্রতিবেশীগণের ভিতর কোন লোক এইরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে অপরেরও ইহা হইবার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষতঃ ছোঁয়াচে রোগ শিশুদের সহজে আক্রমণ করে। কোথাও এইরূপ রোগ দেখা দিলে শিশুদের বিশেষ সাব-ধানতার সহিত রাখিবে।

বসন্ত।

ইহার মত যন্ত্রনাদায়ক ব্যাধি আর নাই, ইহাতে মৃত্যু-সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, যন্ত্রণা খুব বেশী। এবং সহজে অন্য লোককে আক্রমণ করে বলিয়া সকলে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

লক্ষণ—

লক্ষণ—সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ কোমরে খুব বেদনা সহ প্রবল জ্বর, ৩।৪ দিন জ্বরের পর গায়ে মশার কামড়ের

মত লাল দাগ হইয়া ৬।৭ দিনের ভিতর গুটি ভাল করিয়া বাহির হয়, সমস্ত শরীরে, চক্ষের, কাণের ও মুখের গহ্বর হইতে গলার ভিতর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে গুটি বাহির হইতে পারে, । ১০।১২ দিন গত হইলে গুটির ভিতর পুঁজ হয়, সহজ রকমের হইলে তৃতীয় সপ্তাহের ভিতর রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সাবধানতা—

বাড়ীতে বা গ্রামে এই রোগ দেখা দিলে সকলেরি টিকা নেওয়া কর্ত্তব্য। যে রোগীর সেবা করিবে, সে টিকা লইবার পর রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবে। রোগীকে স্বতন্ত্র ঘরে রাখিবে, ও শুশ্রূষাকারী ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেনা। যে ঘরে আলো বাতাস আছে, এমন ঘরে পাতলা কাপড়ের মশারীর মধ্যে রোগীকে রাখিবে। রোগীর কাপড়, বিছানা সব পোড়াইয়া ফেলিবে, কোন পুকুরে ধুইবে না। আরোগ্য হইয়া গায়ে চামড়া না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যের সঙ্গে মিশিতে দিবে না, রোগীর গায়ে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, সর্ব্বদা তাহা করিবে। ঘরের প্রত্যেক দরজা জানালা পাতলা কাপড়ের পরদা দিয়া, তাহা সর্ব্বদা কার্ব্বলিক এসিড্ দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। শুশ্রূষাকারীদের শরীরে এই বিষ প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য রোগ আরোগ্যের পর ৩ সপ্তাহ কাল শুশ্রূষাকারীদের স্বতন্ত্র থাকা ভাল, ইহাতে রোগ সংক্রামণের ভয় কম থাকে।

প্রতিষেধক উপায়—

যে উপায় পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাকে প্রতিষেধক উপায় বলা হয়। বসন্তের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রথম উপায় প্রত্যেক ৩ বৎসর অন্তর টীকা নেওয়া। অনেক লোকের ধারণা শিশুদের ১৮ মাসের পূর্ব্বে টীকা নেওয়া ভাল নয়, ইহা ঠিক কথা নয়, শিশুর ৬ মাস বয়সেই টীকা নেওয়া কর্ত্তব্য। যদি বসন্ত রোগ দেখা দেয়, তবে ১০।১২ দিনের শিশুকেও টীকা দেওয়া যাইতে পারে। জার্ম্মাণীতে সূতিকা ঘরেই টীকা দেওয়া হয়, অন্যথা শিশুর পরিবারস্থ লোকের জরিমানা হইয়া থাকে। এই কারণে জার্ম্মাণীতে লোকের বসন্ত হয় না। টীকা লইবার ১ বৎসর পর, যদি যে গ্রামে বা সহরে বাস করে তথায় বসন্ত মহামারী দেখা দেয়, তবে আবার টিকা নেওয়া ভাল। মেয়েদের টীকা দিতে পিতা মাতা যেন অবহেলা না করেন, একেইত পিতা কন্যাদায়গ্রস্ত তার উপর যদি বসন্ত রোগগ্রস্ত হইয়া কন্যার মুখের চেহারা বিকৃত হয়, তবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যে আরও বিপদগ্রস্ত হইবেন এটা যেন মনে থাকে। তাই বলি "সাধু সময় থাকিতে সাবধান।" গাধার দুধ সেবন, কণ্টিকাঠীর পাচন বসন্তের প্রতিষেধক।

পানিবসন্ত।

এই রোগ খুবই সংক্রামক বটে, তবে মারাত্মক নহে।

জ্বর হইয়া কোথাও বা জ্বর না হইয়া গুটি গুলি ভিতরে জল লইয়া বাহির হয়।

সাবধানতা—

রোগীকে পৃথক রাখা, ব্যবহার্য্য কাপড়, বিছানা ইত্যাদি গরম জলে সিদ্ধ করা এবং ঘা শুকাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত অন্যের সঙ্গে মিশিতে না দেওয়া।

হাম।

এই রোগ ছোট শিশুদের পক্ষে অনেক সময় বিপদজনক। সাধারণতঃ ৫।৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই শিশুদের এই রোগ হইতে দেখা যায়।

কারণ—

নাকের ভিতর দিয়া এই রোগ শরীরে প্রবেশ করে। রোগীর কাস, কফ্, থুতু, বিছানা ইত্যাদির ভিতর দিয়া এই রোগ-জীবাণু অন্যে সংক্রামিত হয়।

লক্ষণ—

সর্দ্দি ও কাসের সঙ্গে জ্বর আরম্ভ হয়, ৩।৪ দিন পর সর্ব্ব-প্রথমে মুখে ও বুকে মশার কামড়ের মত গোলাপী রঙের দাগ প্রকাশ হইয়া ক্রমে সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া যায়। ৭।৮ দিনের ভিতর সারিয়া যায়। কখনও কখনও হামের সঙ্গে অথবা হাম সরিয়া গিয়া নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্ হয়, পেটের

অসুখ আমাশয় হইতে দেখা যায়। এইরূপ হইবার উপক্রম হইলেই চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

হাম দেখা দিলে, রৌদ্রে জল গরম করিয়া শিশুর শরীর সাবধানতার সহিত মুছাইয়া দিবে।

সাবধানতা

হামগ্রস্ত শিশুকে অন্য শিশুর সহিত মিশিতে দিবে না, পৃথক ঘরে রাখিবে। থুতু, কাস্, কফ্ পোড়াইয়া ফেলিবে। বিছানা কাপড় গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

এই রোগের বিষ রোগীর থুতু, কাশি ও কফের সঙ্গে থাকে। সুস্থ ব্যক্তির নাসিকা ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বিষ প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। স্যাঁতসেঁতে ঘরে বাস এই রোগের কারণ।

লক্ষণ

জ্বর, কাশি, সর্দ্দি। জ্বর ৩।৪ দিনে আরোগ্য না হইলে নিউমোনিয়া ব্রংকাইটিস্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাতে হৃদ্-পিণ্ড দুর্ব্বল হয়। এই রোগ একবার হইলে বার বার হইবার আশঙ্কা থাকে।

প্রতিষেধক উপায়—

রোগীকে একা এক ঘরে রাখিবে। ঘরে আলো বাতাস খেলে এইরূপ ব্যবস্থা করিবে। রোগীর থুতু, কাশ, কফ,

কোন পাত্রের ভিতর লাইসোল, কার্ব্বলিক এসিড্ লোসন, না হইলে অন্ততঃ কেরোসিন তৈল রাখিয়া, তাহার ভিতর ফেলিবে এবং তাহা সর্ব্বদা পোড়াইয়া ফেলিবে, রোগীর ব্যবহার্য্য জিনিষ অন্যে ব্যবহার করিবে না, শুক্‌না খট্‌খটে ঘরে বাস করিবে।

ডিপ্‌থিরিয়া

এই রোগ অতিশয় সাংঘাতিক ও অত্যান্ত ছোঁয়াচে, অল্প বয়স্ক শিশুদেরই বেশী হয়। এই রোগ হইলে শিশু প্রায়ই-মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বর্ত্তমানে সিরাম ইন্‌জেক্‌সনে মৃত্যু সংখ্যা কম হইয়াছে।

লক্ষণ—

জ্বর কাশি টন্‌সিল ফোলা, গলার বেদনা। টন্‌সিলে সাদা সাদা দাগ পড়ে, এই সব দাগ হইতে পরদার সৃষ্টি হইয়া শ্বাসনালী বন্ধ হইয়া রোগী মারা যায় এই রোগ সন্দেহ করিলেই, ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবে।

সাবধানতা—

এই রোগ বাড়ীতে কাহারও হইলেই অন্যান্য শিশুদের অন্য বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিবে। কেন না এই রোগ ভয়নাক ছোঁয়াচে। রোগীর ঘরে সর্ব্বদা ক্রিয়োজোট ও কার্ব্বলিক এসিড্ বা আল্‌কাত্‌রার ধূয়া দিবে। রোগীর কফ্, কাশি, ঔষধ লাগাইবার তুলি সর্ব্বদা পোড়াইয়া ফেলিবে, কফ্ কাশি সর্ব্বদা কার্ব্বলিক লোসনের ভিতর ফেলিবে।

রোগীর বিছানাদি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। শুশ্রূষা-কারী ব্যতিত রোগীর ঘরে অন্যের প্রবেশ নিষেধ, রোগীর গলায় ঔষধ লাগাইবার সময় সাবধান হইয়া ঔষধ লাগাইবে। যেন রোগীর নিশ্বাস, হাঁচি, কাশি শুশ্রূষাকারীর মুখে, নাকে না যায়। শুশ্রূষাকারীকে ডিপথেরিয়া সিরাম ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া ভাল।

কলেরা, টাইফয়েড জ্বর—

এই সকল ব্যাধির জীবাণু বা বিষ খাদ্য দ্রব্য, পানীয় জল বা দুধের সঙ্গে কাহারও উদরস্থ হইলে কলেরা বা টাই-ফয়েড্ জ্বর হয়।

রোগ বিস্তারের কারণ—

(১) রোগীর মল, মূত্র, বমির ভিতর এই বিষ থাকে, যদি জলের ভিতর এই সব মল মূত্র ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যে সব কাপড়ে বিছানায় এই সব ময়লা থাকে তাহা জলে ধৌত করা হয় তবে অপরে সেই দূষিত জল পান করিলে কলেরা টাইফয়েড্ ও অন্যান্য পেটের অসুখ হইতে পারে।

(২) রোগীর মলের উপর, বমির উপর, মল সংযুক্ত বিছানার উপর যখন মাছি বসে, তখন তাহার পায়ে এই সকল রোগের কীট বা বিষ জড়াইয়া যায় এবং সেই মাছি যখন অন্যের দুধে, ভাতে, জলে ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যে বসে তখন সেই বিষ খাদ্য দ্রব্যে লাগিয়া যায় এবং সেই খাবার খাইলেই অন্যের এই সব রোগ হয়।

সাবধানতা—

এই সকল রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিম্ন-লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(১) খাদ্য দ্রব্যে যাহাতে মাছি না বসে—

(২) জল ও দুধ সর্ব্বদা ফুটাইয়া খাইতে হইবে।

(৩) কলেরা ও টাইফয়েড্ রোগীর বাহ্যে, বমি, মাটিতে গর্ত্ত করিয়া মাটি চাপা দিয়া পুতিয়া ফেলিবে।

(৪) রোগীর কাপড় বিছানা কখনও নদী বা পুকুরে ধৌত করিবে না। সর্ব্বদা গরম জলে সিদ্ধ করিবে। ইহাতে রোগ জীবাণু মরিয়া যাইবে।

(৫) রোগীর শুশ্রূষাকারীরা সর্ব্বদা হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ লোসন, ফিনাইল ও সাবান দিয়া হাত ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবেন।

কলেরার মত আমাশয় (ডিসেন্ট্রি) অনেক সময় সংক্রামক রূপে শিশুদিগের ভিতর দেখা দেয়, সেই সময়ও উপরোক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

যক্ষ্মা

এই রোগ ভয়ানক ছোঁয়াচে, কোন পরিবারে এক জনের এই রোগ হইলেই, পরিবারস্থ প্রত্যেকেরই অসাবধানতার জন্য উক্ত রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। শিশুদের মধ্যে অনেকের উক্ত রোগে মৃত্যু হয়। এই রোগের কীটাণু

দীর্ঘকাল রৌদ্রের ভিতর জীবিত থাকিতে পারে, ধূলা বালির সঙ্গে শ্বাস পথে গেলে ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হয়। গলার ভিতর গেলে গলার গ্রন্থি ফুলিয়া যায়। খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে কিম্বা পানীয় জলের সঙ্গে গেলে পাকস্থলী ও অন্ত্রে ঘা হয়। হাড়ের ভিতরও এই রোগ হয়।

লক্ষণ—

জ্বর, কাশি, রাত্রকালে ঘাম হয় ও শরীর শুকাইয়া যায়। অন্ত্রে ক্ষত হওয়ার জন্য পূজের মত মল, ফুসফুসে ঘা হইবার জন্য পাকা কফ, কফের সঙ্গে রক্ত অথবা গলা দিয়া টাট্‌কা রক্ত বাহির হয়। গলার গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে গলার উভয় পাশের গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হয়, ইহাকে গণ্ডমালা কহে।

সাবধানতা—

(১) রোগীর কফ, কাশি, মলের সঙ্গে রোগ জীবাণু থাকে। ইহা সর্ব্বদা পোড়াইয়া ফেলিবে।

(২) লাইসোল লোসন, কার্ব্বলিক এসিড্ লোসন, ইহার অভাবে কেরোসিন তেলের ভিতর সর্ব্বদা রোগী কাশ, কফ ফেলিবে।

(৩) ঘরের মেজেতে বা দেয়ালে, যেখানে সেখানে থুথু, কাশ, কফ ফেলিবে না।

(৪) রোগীর ব্যবহার্য্য কোন জিনিষ অন্যে ব্যবহার করিবে না। রোগীর সহিত একত্র এক ঘরে শুইবে না।

(৫) রোগীকে সর্ব্বদা মুক্ত হাওয়ার ভিতর রাখিবে, কখনও বন্ধ ঘরে রাখিবে না।

(৬) রোগীকে পুষ্টিকর, সহজে হজম হয় এরূপ জিনিষ খাইতে দিবে।

(৭) শরীরে রৌদ্র লাগাইবে, রৌদ্রে রোগ-জীবাণু নষ্ট করে।

(৮) শিশুকে খেলনা প্রভৃতি দিয়া সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে।

হুপিং কাশি।

এই রোগ ছেলেদের পক্ষে মারাত্মক ও ছোঁয়াচে, ছোট শিশুদেরই বেশী হয়। শিশুরা কাসিতে কাসিতে বমি করিয়া অস্থির হইয়া যায়, চোখ মুখ লাল হইয়া উঠে, কাশিবার সময় শব্দ হয়। এই রোগ হইলেই চিকিৎসক ডাকিবে। অন্যান্য শিশুদিগকে রোগীর সহিত মিশিতে দিবেনা। কফ্, কাশি, লাল যাহা মুখ দিয়া বাহির হয়, সব পোড়াইয়া ফেলিবে।

রৌদ্র ও বাতাস—

পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোকেরা রৌদ্রে বসিয়া শিশুদের তেল মাখায়, এবং শিশুদের রৌদ্রে রাখিয়া দেয়, ইহাতে শিশুর দেহ নীরোগ হয়। যাহারা দিবসের অধিকাংশ সময় প্রখর রৌদ্রের ভিতর, মুক্ত বাতাসে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে, তাহাদের ভিতর যক্ষা প্রভৃতি রোগ প্রায়ই হয়

না, কেননা রৌদ্র রোগ জীবাণু নষ্ট করিয়া শরীর নীরোগ করে ; তজ্জন্য অনেক দেশে রৌদ্র-চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রৌদ্রের অপর গুণ শরীরের কার্য্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করা। এই সব কারণে দিনের ভিতর কিছু সময় অনাবৃত দেহে, মাথা ঢাকিয়া শিশুদের রৌদ্রে খেলিতে দেওয়া উচিত, ইহাতে রং একটু কাল হইলেও তাহারা নীরোগ ও শক্তিশালী হইবে।

ডিস্-ইন্-ফেক্‌সন্ বা শোধন—

সংক্রামক ব্যাধীগ্রস্ত লোক যে ঘরে এবং যে বিছানায় শয়ন করে, সেই ঘর ও বিছানা শোধন না করিয়া, ব্যবহার করা উচিত নয়। সংক্রামক ব্যাধীর জীবাণু বা বিষ ঘরের দেয়ালে, বিছানায়, ঘরের ধূলায় মিশিয়া থাকে, অপর ব্যক্তি যখন সেই ঘরে বাস করে বা বিছানা পত্র ব্যবহার করে, তখনই সেই বিষের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যক্ষা প্রভৃতি রোগের জীবাণু দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, অতএব কেহ যেন একথা মনে না করেন, ঘর দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখিলেই রোগের জীবাণু হইতে মুক্ত হইল। নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঘর ও আসবাব শোধন অর্থাৎ বিষ-মুক্ত করিয়া লইবে।

(১) যে ঘরে যক্ষা, বসন্ত, ডিপ্‌থেরিয়া রোগী ছিল, সেই ঘর পাকা হইলে তাহার আস্তর ফেলিয়া দিয়া, করোসিভ লোসনের পিচ্‌কারী দিয়া পরে নূতন করিয়া চূনকাম করা উচিত।

দুর্গাধিপতি
তাহার শত্রু এবং মিত্রগণ
তুমি কোন পক্ষে?
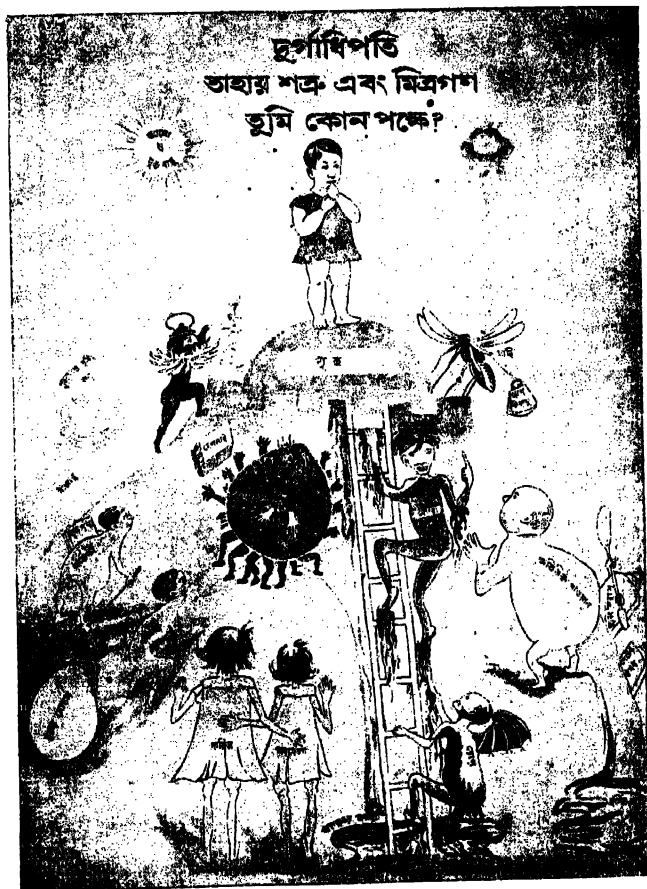
(২) সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর বিছানা প্রভৃতি গরম জলে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিবে।

(৩) ঘরের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া কয়েক দিন গন্ধক পোড়াইবে।

(৪) বাজারে ব্লীচিং পাওডার বলিয়া এক রকম ঔষধ বিক্রয় হয়, উক্ত পাউডার ১ সের একটী পাত্রে রাখিয়া, তার উপর ½ সের পরিমান হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢালিয়া দিবে, যে গ্যাস বাহির হইবে, তাহা যাহাতে বাহির হইয়া না যাইতে পারে, তজ্জন্য ঘরের দরজা জানালা পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়া দিবে। এসিড ঢালিয়া দ্রুত বাহির হইয়া আসিবে, যেন ধূয়া নাকে না যায়। ইহাতে ঘর শোধিত হয়।

(৫) সংক্রামক রোগীর ঘর কখনও ঝাঁট দিবেনা, কার্ব্বলিক এসিড, লাইসোল লোসন অথবা করোসিভ লোসনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ঘরের মেঝে মুছিয়া দিবে।

দশম অধ্যায়।

শিশুর শিক্ষা

শিশুকে কি করিয়া প্রতিপালন করিতে এবং সবল ও সুস্থ রাখিতে হয়, পূর্ব্বে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু মানবের পূর্ণতা কেবল দেহের সবলতায় নহে, দেহের

ও মনের পূর্ণ বিকাশে। ভগবান আমাদের দেহের ভিতর যে শক্তি, মনের ভিতর যে সকল বৃত্তির বীজ দিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিকাশের প্রণালীকে শিক্ষা কহে। আহার, বিহার, সন্তান পালনের প্রবৃত্তি মানুষ ও ইতর প্রাণী উভয়ের ভিতরই আছে, কিন্তু মানবের বিশেষত্ব কোথায়? এই পরিদৃশ্যমান জগতে ও নিজের মধ্যে বিধাতার লীলা প্রত্যক্ষ করা, দয়া, প্রেম, ন্যায়পরতা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, দায়িত্ব বোধ, স্বাধীনতা, স্বজাতি ও স্বদেশ প্রীতি প্রভৃতি মানব মনের বৃত্তি-গুলির সম্যক স্ফুরণই মানবের বিশেষত্ব। অতএব শিশুর দেহের পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের সর্ব্বপ্রকার বিকাশের চেষ্টা করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা স্কুলে

সর্ব্ব-প্রাথমিক শিক্ষা গৃহে ও মায়ের কাছে।

শিশুর শিক্ষায় পারিবারের দায়িত্ব—

পাঁচ বৎসর বয়স হইতে শিশুকে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা শিশুর সর্ব্ব প্রাথমিক শিক্ষা, পিতা, মাতা, পরিবারস্থ ও প্রতিবেশী লোকের নিকট আরম্ভ হয়। এই শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান দায়িত্ব মাতার, কেন না শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী মাতা, তারপর পিতা ও পরিবারস্থ লোক। শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি ভাল হয়, তবেই তাহার

শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে সূতিকা-ঘরের সুব্যবস্থা, শিক্ষিতা ধাত্রী ও মায়ের স্বাস্থ্যের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। তেমনি পিতা মাতার ও পরিবারস্থ লোকের মানসিক স্বাস্থ্য যথা সরলতা, সত্যানুরাগ সহিষ্ণুতা, সুবুদ্ধি, সৎইচ্ছা, সাধুতা, সহৃদয়তা, চরিত্রের বিশুদ্ধতা, সেবা, পারিবারিক আনন্দ প্রভৃতি মানসিক গুণের ভিতর যে শিশু বর্দ্ধিত হয়, সে ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্থ, সবল, বড় মন লইয়া সংসারে জীবন ধারণ করে। অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, অশিক্ষিতা ধাত্রী প্রভৃতির জন্য যেমন শিশুর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া, অকাল মৃত্যু হয়, তেমনি গৃহ পরিবারের অশিক্ষা, নৈতিক হীনতা, নিরানন্দ গৃহ বহু শিশুর নৈতিক মৃত্যুর কারণ হয়।

শিশুর সর্ব্বপ্রাথমিক শিক্ষা অনুকরণে—

'শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে, সেই সময় হইতে দেখা ও শোনার ভিতর দিয়া তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়, দুইটী সত্য ঘটনা দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

(১) মেদিনীপুর জেলার এক গভীর অরণ্যে বাঘের গর্ত্তের ভিতর, বাঘের বাচ্চার সঙ্গে দুইটী বালিকা পাওয়া গিয়াছে, বড়টীর বয়স তখন ৭।৮ বৎসর, ছোটটী ৩।৪ বৎসরের। ইহার ভিতর বড়টী এখনও জনৈক সহৃদয় খৃষ্টান পাদ্‌রীর গৃহে প্রতিপালিত হইতেছে, ছোটটী মারা গিয়াছে। ইহাদের

যখন বাঘের নিকট হইতে অতি কষ্টে উদ্ধার করা হইল, তখন দেখা গেল, ইহারা অন্যান্য বাঘের বাচ্চার সঙ্গে, বাঘিনীর দুধ, কাঁচা ও গলিত মাংস খায়, বাঘের মত চারি হাত পায় চলে, বাঘের মত শব্দ করে, দৃষ্টিও বাঘের মত তীব্র, নখ খুব বড়, এবং ঐ নখের দ্বারা অন্যকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। ইহাদের উদ্ধার করার পর বড় মেয়েটীকে অনেক চেষ্টায় ভাত খাইতে শিখান হইয়াছে, এখন মানুষের মত চলিতে ও কাপড় পরিধান করিতে পারে বাবা মা ইত্যাদি দুই একটা কথা বলিতে পারিতেছে। একটী মানব শিশুর এ প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা হইল কেন? এর একমাত্র কারণ সে দুর্ভাগ্য বশতঃ শৈশবে মানব সমাজের সংসর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া, বাঘের সঙ্গে ছিল; সেখানে যাহা দেখিয়াছে ও যাহা শুনিয়াছে, তাহার চরিত্র, আচার ব্যবহার ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে এই দেখা ও শোনার ভিতর দিয়া শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়।

(২) ভগ্নী ডোরা বিলাতের বিখ্যাত সেবা পরায়ণা নারী ছিলেন। তাঁহার সেবাশ্রমে অনেক অন্ধ আতুর বাস করিত। দরিদ্র ও রুগ্নের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। একদিন একটী স্ত্রীলোক, তাহার তিন বৎসর বয়স্কা এক বালিকা কন্যার পায়ের ঘা চিকিৎসার জন্য ভগ্নী ডোরার নিকট লইয়া আসিল। তিনি সস্নেহে শিশুটীর পায়ের ঘা ধুইতেছিলেন, তখন বালিকা বেদনার জন্য অতি

কুৎসিত ভাষায় গালি দিতেছিল, বালিকার মা লজ্জায় বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। ঘা ধোয়াইয়া, ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর, ভগ্নী ডোরা বালিকাকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া মিষ্ট ব্যবহারে শান্ত করিয়া অল্প সময়ের ভিতর স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে শিশুকে আপনার বাধ্য করিলেন। তৎপর তিনি শান্ত-ভাবে বালিকার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভগিনী, তোমার কন্যা আমার কাছে এইরূপ কুৎসিৎ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া তুমি লজ্জিত হইয়াছ, আমি জিজ্ঞাসা করি, এ এইরূপ কুৎসিত কথা কোথায় শুনিল? তার তো এমন বয়স হয় নাই যে, পাড়ার দুষ্ট বালকদের সঙ্গে মিশিয়া এ সব শিখিয়াছে। নিশ্চয় তোমাদেয় গৃহে এই সব কুৎসিত ভাষায় ঝি, চাকরকে, অথবা সন্তানদের গালাগালি করা হয় বলিয়া তোমার শিশু কন্যা শুনিয়া শুনিয়া এই সব কথা শিখিয়াছে। মনে রাখিও শিশুদের শিক্ষা মায়ের কোলেই দিতে হয় এবং পিতা, মাতা ও পরিবারস্থ লোকের দোষেই শিশুরা খারাপ হয়।"

ভগিনী ডোরার এ কথা কি সত্য নহে? আমরা প্রত্যেক দিন ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই না কি? যে পরিবারের লোকেরা হারামজাদা, পাজি, প্রভৃতি বিশেষণে, এবং সাহেবী ভাষাপন্ন বাবুরা চাকরকে যথেচ্ছ "শূয়ার কা বাচ্চা" বলিয়া গালাগালি করেন। তাদের সন্তানেরা যে এই প্রকার মন্দ কথা সর্ব্বদা বলিবে, ইহাতে

আর আশ্চর্য্য কি ? কেননা শিশুরা যাহা শোনে টিয়া পাখীর মত তাহাই শিখে।

উপরোক্ত দুইটী ঘটনা দ্বারা দেখান গেল শিশুরা যাহা দেখিবে ও শুনিবে, তাহা দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হইবে ; শৈশবে যে শিক্ষা পায়, তাহার প্রভাব চিরদিন তাহার জীবনে কার্য্য করে। শিক্ষায় মানুষ পশু হয় আবার দেবতাও হয়, অতএব শিশুর শিক্ষায় পরিবারস্থ লোকের প্রভাব ও মায়ের দায়িত্ব কত বেশী, তাহা বুঝিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য।

চরিত্র গঠনে পিতামাতার প্রভাব—

ইংরাজীতে একটী কথা আছে "চরিত্রই মানবের শক্তি" জীবন ধারণের পক্ষে যেমন সুস্থ, সবল, নীরোগ দেহের প্রয়োজন, তেমনি সংসারে জয়যুক্ত হইতে হইলে চরিত্রই মানবের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। ঝড় বাতাসে নৌকার মাঝি যেমন হাল ধরিয়া উত্তাল তরঙ্গের ভিতর দিয়া তরণীকে গন্তব্য পথে লইয়া যায়, তদ্রূপ সাংসারিক নানা প্রতিকূলতার ভিতরে চরিত্র কর্ণধার হইয়া জীবন তরণীকে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। চরিত্র লাভ করিতে হইলে শিশুকাল হইতে সকল প্রকার মানসিক গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়।

অনুসন্ধিৎসা—

শিশু একটু বড় হইলেই নানা বস্তুর সম্বন্ধে পিতা মাতাকে এবং নিকটস্থ লোককে প্রশ্ন করে ; সকল বিষয়

জানিবার ইচ্ছা তাহার এত প্রবল যে, এটা কি, ওটা কি এই সকল প্রশ্নে অনেক সময় শিশু বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধীর ও শান্ত ভাবে শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া, তাহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারেন তিনিই শিশুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আর যে পিতা মাতা শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া অজ্ঞতার জন্য ভুল বুঝাইয়া দেন, বিরক্তি প্রকাশ করেন অথবা ধমক দিয়া শিশুকে চুপ করাইয়া দেন, তিনি শিশুর জানিবার স্পৃহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন এবং তাহার জ্ঞান বিকাশের পথ চিররুদ্ধ করিয়া দেন। এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

নিয়মানুবর্ত্তিতা, শৃঙ্খলা, সংযম ও ধৈর্য্য—

মানব প্রবৃত্তি সর্ব্বদা চঞ্চল, সে একটা কাজ শেষ করিতে না করিতে আবার নূতন একটা আরম্ভ করে, শিশুর এরূপ অস্থিরতা আরো বেশী। যে মানব, সর্ব্বদা খেয়াল বশতঃ চলে, সর্ব্বদা ইচ্ছা ও কার্য্যের পরিবর্ত্তন করে, সে জীবনে কখনও কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে না ; তজ্জন্য শৈশব কাল হইতে ধৈর্য্য সহকারে নিয়মের অধীন হইয়া, শৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য করিবার শিক্ষা শিশুদের দেওয়া উচিত। শিশুদের আহার, বিহার, পড়াশুনা, খেলা, আমোদ করা, গল্প শোনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ভাল, শিশু যাহাতে ঠিক সময়ে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য গুলি সম্পন্ন করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

শৃঙ্খলা শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্ব প্রথমে তাহার খেলার স্থান স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া খেলনাগুলি গুছাইয়া রাখিতে, তৎপর শিশুর পাঠ্য বইগুলি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিতে, পরে ৭।৮ বৎসর বয়স হইতে শিশুকে একটী স্বতন্ত্র বাক্স দিয়া তাহার ব্যবহার্য্য কাপড় গুছাইয়া রাখিতে দিলে অল্প বয়স হইতে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যবোধ এবং চরিত্রে সংযম ও ধৈর্য্য আসিবে। ইহারই ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে সকল প্রকার প্রতিকূলতার ভিতর সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার জন্য কষ্ট-সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা, কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

আমোদ প্রমোদ—

শিশুর মন সর্ব্বদাই ক্রিড়াশীল, খেলা ধূলার ভিতর দিয়া তাহার জীবনের স্ফূর্ত্তি হয়, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সাহেবেরা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত খেলিয়া থাকেন, স্ফূর্ত্তি বিহীন জীবন নির্জ্জীব, উৎসাহ ও উদ্যম হীন। পিতা মাতার কর্ত্তব্য গৃহ পরিবারকে আনন্দের নিকেতন করিয়া রাখা, এবং সন্তানেরা যাহাতে স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয় তাহারই ব্যবস্থা করা।

প্রেম, সহানুভূতি, সেবা—

প্রেমই গৃহপরিবার ও মানব সমাজকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে, দুঃখী, আর্ত্তের প্রাণে সান্ত্বনা দেয়, বিশ্ব সংসারকে আপনার করিয়া লয়। বাংলার প্রত্যেক ঘরে ঘরে, প্রত্যেক মানবের অন্তরে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ যে পূজিত

হইতেছেন, তাহার কারণ তাঁহার বিশ্বপ্রেম ; যে প্রেমের কাছে জ্ঞানী অজ্ঞান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, দেশ কালের ভেদাভেদ ছিল না। প্রেমই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, যাহা দ্বারা বিশ্বকে জয় করা যায়। শৈশবকাল হইতে এই প্রেম গৃহপরিবারে শিক্ষা করিতে হয়। বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী বালবিধবার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া বিদ্যাসাগরের প্রাণকে যদি উদ্বুদ্ধ না করিতেন, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার দুঃখ মোচনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেন কি না কে বলিতে পারে ? তাই বলি প্রেম, সহানুভূতি. সেবা পিতা মাতার কাছে গৃহপরিবারে শিক্ষা করিতে হয়।

দারিদ্র, অন্ধ, খঞ্জকে সন্তানের হাত দিয়া দান করিবে, অনাহার-ক্লিষ্ট লোককে সন্তানের দ্বারা খাওয়াইবে, সন্তান একবার সেবার আনন্দ পাইলে ভবিষ্যতে কখনও ভুলিবে না।

গৃহে সমাগত অতিথির পরিচর্য্যার ভার যথা সম্ভব সন্তানদের উপর দিলে, প্রতিবাসীর গৃহের বালক বালিকাদের নিজ গৃহে সন্তানের দ্বারা আহ্বান করিয়া খাওয়াইলে এবং তোমার শিশু যখন কিছু ভাল দ্রব্য আহার করিবে তখন যদি তার কোন সঙ্গী উপস্থিত হয়, তাহাকে সন্তানের খাবারের অংশ দিলে ; সেবার প্রবৃত্তি চরিতার্থতার আনন্দ উপভোগ করিয়া তাহার চরিত্র মহৎ হইবে। দুঃখের বিষয় অনেক মা ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া সন্তানের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। (যথা—সন্তানের হাতে সন্দেশ দিয়া

বলিয়া দেন, যাও লুকাইয়া খাও, তোমার পিসীমার ছেলে যেন দেখিতে পায় না)

স্বদেশ প্রীতি—

স্বদেশ প্রীতি মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, শৈশব হইতে এই বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিতে হয়। দেশের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সম্পদের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনের গল্প, দেশের প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন প্রভৃতির ভিতর দিয়া শিশুর প্রাণে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়।

জননীগণ— স্তন্য সাথে হেন শিক্ষা
পিয়াও সন্তানে,
জন্ম হ'তে মাতৃভূমি
বড় যেন জানে।

সরলতা, সত্যকথন, দোষ স্বীকার—

সরলতা শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সত্য কথা বলা সরলতারই ফল। কুশিক্ষা ও ভয়ের দ্বারা ইহা সহজে নষ্ট হয়।

দৃষ্টান্ত—একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি এক ভদ্রলোক দোকানদারের নিকট হইতে বাকীতে অনেক জিনিষ খরিদ করিয়াছিলেন, সেই পাওনাদার যখন বাড়ীতে আসিয়া ভদ্রলোককে ডাকিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ঘরে থাকিয়াও তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, "বল গিয়া বাবা বাড়ী নাই"। সেখানে তাঁহার ছোট এক কন্যা ছিল, সে অবাক হইয়া পিতার মুখের

দিকে তাকাইয়া করুণ স্বরে বলিল, "কেন বাবা এই তো তুমি বাড়ী আছ, দাদা কেন বল্‌বে তুমি বাড়ী নাই?" এই ঘটনা দ্বারা পুত্রকে মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দিয়া পিতা সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করিয়াছেন, (এই ভদ্রলোকের ছেলেটী চরিত্রহীন হইয়া সকলের অপ্রিয় হইয়া আছে)। অনেক পিতামাতা এই প্রকারে শিশুদের মিথ্যা কথা শিখাইয়া থাকেন, শিশুর অনুকরণশীল দৃষ্টির সম্মুখে এমন কোন কার্য্যই করা ভাল নয় যাহাতে তাহাদের মনে আসিতে পারে মিথ্যা কথা বলিলে কিছুমাত্রও সুবিধা হইবে। সত্যের প্রতি সহজ সম্মান, মিথ্যার উপর ঘৃণা সযত্নে শিশুর সম্মুখে রক্ষিত হইলে, শিশু মিথ্যা বলিবে না।

অনেক পিতা, মাতা, ঝি ও চাকর মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া শিশুকে শান্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করে, ইহা বড় দোষনীয়। বার বার এইরূপ মিথ্যা কথা শুনিয়া শিশুর আর সত্যের উপর বিশ্বাস থাকে না এবং অপরের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে।

সত্যনিষ্ঠ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে একবার একটী ঝি, শিশুকে শান্ত করার জন্য বার বার বলিতেছিল, "কাঁদিও না, চুপ কর তবে সন্দেশ দিব," শিশু সন্দেশের প্রলোভনে শান্ত হইয়াছে, তখন লাহিড়ী মহাশয় ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন "ঝি খোকা তো শান্ত হইয়াছে কৈ সন্দেশ দিলে না?" ঝি বলিল "আঃ মরন ইহার জন্য আবার সন্দেশ দেয়

নাকি।" তখন সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পয়সা দিয়া ঝিকে সন্দেশ আনিয়া শিশুকে দিতে বলিলেন এবং পরদিনই ঝিকে ছাড়াইয়া দিলেন। শিশুকে সত্যবাদী করিতে এবং সত্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখিতে শিক্ষা দিবার জন্য পরিবারস্থ লোকের সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

শিশুরা সর্ব্বদাই চঞ্চল, এই চঞ্চলতার জন্য ঘরের জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে, দোয়াতের কালী দিয়া মূল্যবান গ্রন্থ চিত্রিত করে, কালী ঢালিয়া টেবিল, ঘর নোংরা করে, জিজ্ঞাসা করিলে শিশু স্বভাবতই স্বীকার করিয়া থাকে। পিতামাতা যদি শিশুর সেই সত্য-কথনের সম্মান না করিয়া প্রহার করেন, তবে ভবিষ্যতে চঞ্চলতা বশতঃ শিশু কিছু করিয়া ফেলিলেও শাস্তির ভয়ে দোষ স্বীকার না করিয়া মিথ্যা কথা বলিবে। পরিবারস্থ লোকেরা শিশুর সত্যকথনের উপযুক্ত সম্মান করিতে না পারার ফলেই শিশু দোষ স্বীকার করিতে পারেনা। শিশুকে দোষ ক্রটী গুলি বুঝাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া ভাল, শাস্তি দিয়া মনে ভয় জাগাইয়া দেওয়া ভাল নয়, ইহাতে তাহারা মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত হয়।

পিতা মাতার দোষে সন্তানের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হয়, তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। শিশুরা অনেক সময় কিছু না ভাবিয়া সঙ্গীদের খেলেনা আপন ঘরে লইয়া আসে, অনেক অশিক্ষিতা, বুদ্ধিহীনা মাতা তখন শিশুকে উক্ত খেলেনা লুকাইয়া রাখিতে উপদেশ দেন, ইহা দ্বারা সন্তানকে

চুরি করিতে শিখান হয়। এরূপ স্থলে মা সর্ব্বদাই সন্তানকে সঙ্গে লইয়া খেলেনা ফিরাইয়া দিয়া আসিবেন। অন্যথা সন্তানের স্বভাব মন্দ হইয়া যাইবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অনেক মাতা সাক্ষাৎভাবে সন্তানের দ্বারা অপর গৃহস্থের বাগান হইতে ফল ইত্যাদি লুকাইয়া আনাইয়া থাকেন। মা সন্তানকে বলিতেছেন "খোকা তোর কাকীর গাছ থেকে একটা নেবু নিয়ে আয়, দেখিস কেহ যেন দেখে না"। এরূপ দৃষ্টান্ত অশিক্ষিতা 'মা'দের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় মায়েরা জানেন না এইরূপে সন্তানের কি সর্ব্বনাশ তাঁহারা করিতেছেন।

অনেক পিতা মাতা স্নেহবশতঃ আপন সন্তানের দোষ দেখেন না, অথবা দেখিলেও তাহা লুকাইয়া রাখেন, ইহাতে সন্তানেরা প্রশ্রয় পাইয়া সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় উপনীত হয়। সন্তানের উপর পিতা মাতার সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সন্তান যেন জানে, তাহার কোন ত্রুটীই পিতা মাতার চক্ষু এড়াইতে পারিবে না এবং পিতা মাতার কর্ত্তব্য সন্তানের দোষ সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন না হইয়া সস্নেহে সংশোধনের চেষ্টা করা।

বিনয়, শিষ্টাচার, ভক্তি—

যে গৃহে পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজন পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন, গুরুজনের পদধূলি গ্রহণ, যথাযোগ্য আসনে উপবেশন, প্রত্যেকের চরিত্রের গুণগ্রহণ, সাধু, মহা-

পুরুষদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই গৃহের শিশুরা বিনয়ী ও ভক্তিমান হয়। পক্ষান্তরে যে পরিবারে সর্ব্বদা সমালোচনা, পরনিন্দা, দোষ দর্শনের স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল, সেই পরিবারের শিশুরা অবিনীত, অশিষ্ট, উদ্ধত ও ভক্তিহীন হয়।

যে পরিবারের পিতা মাতা প্রত্যেক দিন তদ্গত চিত্ত হইয়া ভগবানের পূজা, আরাধনা ও ভগবৎ প্রসঙ্গ করেন, তাহার সন্তানেরা স্বভাবতঃ ভক্তিমান হইয়া থাকে। প্রত্যেক দিন প্রাতে ও রাত্রে শয়নের সময় এবং আহারের পূর্ব্বে ভগবানকে প্রণাম করিতে শিখাইলে, শিশুদের প্রাণে ভগবৎ ভক্তি সঞ্চারিত হইবে।

সর্ব্বোপরি গৃহ পরিবারের ভিতর এমন ভাব রচনা করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক শিশুর অন্তরে মহত্ত্বের বীজ স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কুরিত হইবার সাহায্য করে। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ প্রত্যেক গৃহের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য, প্রত্যেক গৃহীকে প্রত্যেক দিন ভক্তির সঙ্গে নিম্নলিখিত পঞ্চ যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন।

(১) দেব যজ্ঞ (পূজা অর্চ্চনা)।
(২) ঋষি যজ্ঞ (শাস্ত্রপাঠ)।
(৩) পিতৃ যজ্ঞ (পিতৃপুরুষ ও মহাপুরুষদের তর্পণ)
(৪) উদ্ভিদযজ্ঞ (বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা)।
(৫) ভূত যজ্ঞ (মানব, পশু, পক্ষীদের পরিচর্য্যা)।

এমন একদিন ছিল যখন প্রত্যেক দিন শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহস্থাশ্রমে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত, বালক বালিকারা এই যজ্ঞানুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে পূজার জন্য পুষ্পচয়ন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ, বৃক্ষাদিতে জল সিঞ্চন, গৃহাগত অতিথির ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর সেবা করিত। দুঃখের বিষয় আমরা সবই হারাইয়া ফেলিয়া, আজ সর্ব্বপ্রকারে নিস্ব হইয়া পড়িয়াছি, তাই আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলকে অনুরোধ জানাইতেছি, আবার গৃহে গৃহে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেশের দুঃখ দূর করিতে যেন যত্নবান হই। এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া শিশুর চরিত্র গঠনের উপযোগী প্রায় সকল উপাদানই আমরা প্রাপ্ত হইব।

উপসংহার

একদা এক ভদ্রলোক নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ফরাসী জাতি কি করিলে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারে? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন "যদি ফরাসী জাতির গৃহে গৃহে সুশিক্ষিতা চরিত্রবতী মাতা থাকেন, তবেই এই জাতির ভিতর শক্তিশালী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া ফরাসী জাতিকে জগতের ভিতর শ্রেষ্ঠ জাতি রূপে পরিগণিত করিবে।" অতএব জাতি গঠনে ও শিশুর শিক্ষায় মাতার হস্ত সর্ব্বপ্রথম, ইংরাজীতে একটা কথা আছে—

She who rocks the cradle
Rules the world.
—শিশুর দোলা যে মায়ের হাতে
তারই কাছে জগৎ মাথা পাতে।

ইহার অর্থ মা যে হৃদয় মন লইয়া, যে হস্তে শিশুর দোলনায় দোল দেন ; মায়ের সেই হৃদয় মনের প্রভাবে, তাঁহার হাতের সুপরিচালনে তিনি শিশুকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারেন, যাহাতে শিশুর চরিত্রের কাছে জগতের লোক শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা অবনত করিবে। প্রত্যেক মাতা শিশুর চরিত্রে সেই বীজ বপন করুন, এই প্রার্থনা। ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রান্ত	সংশোধিত
৭	৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৫	ঋ্বতু	ঋতু
৮	৮	ভাজ ভাজ	ভাঁজ ভাঁজ
৯	৬	জরায়ুর	জরায়ুর
১৩	২	গর্ভিনীর	গর্ভিণীর
১৫	১	ঐ	ঐ
১৫	১১	গর্ভিনী	গর্ভিণী
৩০	২৬	আঁতুর (আতুড়)	আঁতুড় (আতুর
৩২	২০	শর্করা	শর্গরা
৫৬	৬	পরে	পড়ে
৬৪	১২	আঁতুর	আতুড়
৭৪	১৯	চঁক্ষে	চক্ষে
৭৫	২	পিতামার	পিতামাতার
৭৫	১৪	পিছুটী	পিচুটী
৭৫	২১	পড়ান	পরানো
৭৬	১৭	পাটকেলে বর্ণের থকে,	পাটকিলে বর্ণের থাকে
৯৫	১২	শক্তি সে লাভ	শক্তি লাভ
১২০	২২	খষ্টান	খৃষ্টান
১২৬	১২	দারিদ্র	দরিদ্র